চিন্তাপ্রসূন

শ্রী অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
অধ্যাপক, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়।

১৩৪৪

প্রবন্ধ পরিচয়

জীব, ঈশ্বর, জগৎ প্রভৃতি চরমতত্ত্বের স্বরূপ দর্শন করাই দর্শন শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। তথাপি এই সকল চরমতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া দার্শনিকগণ পরোক্ষভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাকণ্টকিত পথ কি ভাবে সুগম করিয়াছেন তাহার কথঞ্চিৎ পরিচয় দিবার জন্য বহুদিন পূর্ব্বে মাতৃভাষাতে দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি; কিন্তু নানাকারণে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। যোগ্যতর ব্যক্তির প্রচেষ্টায় উদ্দেশ্যটি কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, এই আশাতে প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

প্রথম প্রবন্ধটি কাশী হইতে প্রকাশিত "অলকা" পত্রিকাতে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রবন্ধ দুইটি "সাহিত্য" পত্রিকাতে প্রথম বাহির হয়। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলি সভাপতির অভিভাষণ রূপে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের ইন্দোর, নাগপুর ও দিল্লীর অধিবেশনে, এবং এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

শ্রী অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
২২শে বৈশাখ, সন ১৩৪৪।

Published by
T. C. Chatterji, B. A.,
The Leader Road,
Allahabad.

Printed at the Globe Press,
New Katra
Allahabad

সূচী

	বিষয়		পৃষ্ঠা
১	পাশ্চাত্যদর্শনে চিন্তার ধারা	...	১
২	পাশ্চাত্যমধ্যযুগের চিন্তাপদ্ধতি	...	৩৪
৩	মহামনীষী কাণ্ট	.	৫২
৪	সমসাময়িক ভারতীয়দর্শন	..	৬২
৫	দর্শনশাস্ত্র ও যুগসমস্যা	...	১০২
৬	অবসন্ন সাহিত্য	...	১১৮

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮	১৫	বিবৃত্ত	বিবৃত
৩২	৯	উপনীত	উপনীত
৩৬	৩	সম্পুর্ণ	সম্পূর্ণ
৪১	১২	কঠোরস্পর্শে	কঠোরস্পর্শে
৪৪	১৯	উদ্বোধনের	উদ্বোধনের
৬৯	১	ব্যাখার	ব্যাখ্যার
৮৫	২	কয়িয়াছিলেন	করিয়াছিলেন
৯০	১৮	স্বম্প্রদায়ভুক্ত	স্বসম্প্রদায়ভুক্ত
৯২	১	চিন্তাপ্রস্থন	চিন্তাপ্রসূন
৯৪	ঐ	ঐ	ঐ
৯৫	৯, ১০, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১	সত্ত্বা	সত্তা
৯৬	১	চিন্তাপ্রসুন	চিন্তাপ্রসূন
১০৭	৮	জলর	জলের
১২১	১৪	সর্ম্মিলনীর	সম্মিলনীর
১২২	১০	অনত্র	অন্যত্র
১২৬	১৮	অসম্পুর্ণতা	অসম্পূর্ণতা

পাশ্চাত্য দর্শনে চিন্তার ধারা

যে আলোকের ধর্ম্ম বস্তুকে প্রকাশ করা, সেই আলোক যখন সহসা তীব্রভাবে নয়নপথে আসিয়া পড়ে, তখন সে বস্তুর গোপন করে। ঐ আলোকের তীব্রতা ইন্দ্রিয়ের স্বভাববিরুদ্ধ বলিয়া এ ক্ষেত্রে উহার বস্তুগত ধর্ম্মটির অভি-ব্যক্তি হইতে পারে না। যদি জোর করিয়া ইন্দ্রিয়কে ঐ তীব্র আলোক বরণ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে দর্শনেন্দ্রিয়ের যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহাও লোপ পায়। তেমনই হিন্দু সমাজের আদর্শ স্থানীয়, ভোগস্পৃহা বিরত, কোনও সদ্‌ব্রাহ্মণকে যদি পাশ্চাত্য সমাজের রীতি অনুসারে কোটপ্যাণ্ট ও বুট পরিয়া উপাসনা, কাঁটাচামচে লইয়া টেবি-লের উপর ভোজন ও নেক্‌টাই গলায় লাগাইয়া চেয়ারে উপবেশন করিতে বাধ্য করা হয়, কিংবা একজন পাশ্চাত্য সভ্যতায় অভ্যস্ত ইংরাজকে ললাটে ত্রিপুণ্ড্র, গাত্রে নামাবলি, অজিনাসনে উপবেশন, হবিষ্যান্ন ভোজন প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্মের কঠোর শাসন মানিয়া চলিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে উভয় পক্ষেই মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলের আশঙ্কাই অধিক। মানুষকে যদি হস্ত দ্বারা ভ্রমণ ও পদ দ্বারা গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলে এই হস্তপদের নিজ নিজ ধর্ম্ম

পরিবর্ত্তনের জন্য মানুষের যে অমঙ্গল হয়, একটি সমাজের ধর্ম্ম সমাজান্তরের ধর্ম্ম দ্বারা বিনষ্ট হইলে, বিশ্ব মানবেরও সেই প্রকার হইবারই অকল্যাণ সম্ভাবনা। জগতে যেমন প্রত্যেক জিনিষের একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে, তেমনই প্রত্যেক সমাজ ও প্রত্যেক সভ্যতারও একটি বিশিষ্টতা আছে। এই স্বাতন্ত্র্য ও বিচিত্রতা আছে বলিয়াই জগৎ কল্যাণের আকর। তাই সাধারণতঃ দেখা যায় যে, যাঁহারা নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে এই ধর্ম্মদ্বয়ের একটিও সম্পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। ব্যক্তিত্বের সংরক্ষণ ব্যতীত ধর্ম্মের স্ফুরণ হয় না; যে নিষ্ঠা ও সংযমকে ভিত্তি করিয়া ধর্ম্মজীবন পরিপুষ্ট হয়, নূতন ধর্ম্মের স্পর্শে তাহা বিনষ্ট হয় বলিয়া উহাকে পরিহার করাই শ্রেয়স্কর। তাই ধর্ম্মবিষয়ে ভারতের বাণী—"স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"। এই ধর্ম্মজীবনের আদর্শ ব্যতীত ভারতের আরও একটি আদর্শ আছে সেটি স্থূল-দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় ইহা অন্য ভাবের; এটি জ্ঞানের আদর্শ। এই নূতন রাজ্যে ভারতের বাণী—"আত্মবৎ সর্ব্ব-ভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ"। ধর্ম্মজীবনে চাই ব্যক্তিত্বের সংরক্ষণ, কিন্তু এখানে চাই ব্যক্তিত্বের বিসর্জ্জন। জ্ঞানের রাজ্যে নূতনের স্পর্শে পুরাতন কলুষিত না হইয়া বরং পুষ্টিলাভ করে। তাই সাধারণতঃ মনে হয় যে, এই আদর্শ দুইটির মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে। কিন্তু বাস্তবিক

ইহারা বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন নয়, এইটিই যেন ভারতীয় সাধনার বিশেষত্ব বলিয়া বোধ হয়। এখানে ধর্ম্ম ও জ্ঞান পরস্পর একসূত্রে গাঁথা। এখানে জ্ঞানের পরিণতি হয় ধর্ম্মের মধ্য দিয়া, আর বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে হয় আবাহন। সেইজন্য ভারতের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ যদিও জ্ঞান, তথাপি জ্ঞানের উপাসককে ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিলে চলে না। এই কথাটিই বেদান্তের অনুবন্ধের বক্তব্য।

জ্ঞানের রাজ্যে আত্মবিসর্জ্জনের প্রয়োজন কেন হয় তাহার কতকটা আভাস সাধারণ জ্ঞানের লক্ষণ হইতেও পাওয়া যায়। জ্ঞানরাজ্যের নিয়মই এই যে, সেখানে ব্যক্তিগত ভাবে কোন জিনিষের স্থান নাই, এবং সেখানে নূতন ও পুরাতনের মধ্যে বিরোধ নাই। আর জ্ঞানের লক্ষ্য যে সত্য তাহা কাহারও ব্যক্তিগত সীমার মধ্যে বদ্ধ থাকিতে চায় না। যে জিনিষ সত্য সত্যই সাদা তাহাকে আমি আমার রোগগ্রস্ত নয়নের উপর নির্ভর করিয়া যদি হলদে বলি, তাহা হইলে এই কল্পিত গণ্ডীর মধ্যে সত্যকে পাওয়া যায় না। সেইজন্য যিনি জ্ঞানের উপাসক তাঁহাকে আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বিশ্বের দ্বারে অতিথি হইতে হয়। তেমনই আবার আমি যদি প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যা ত্যাগ করিয়া, গঙ্গাস্নান সন্ধ্যাবন্দনাদি করার পর মধ্যাহ্নে একবার মাত্র নিরামিষ আতপান্ন ভোজন করি, এবং ইহাতে যদি কোন ডাক্তার আমার স্বভাবগুলিকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যহানিকর ভাবিয়া

প্রাতে সাত ঘটিকার সময় শয্যাত্যাগ করিয়াই বিস্কুটসহ চা, মধ্যাহ্নে আমিষাদি পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন প্রভৃতি সভ্যজগতের রীতি অনুযায়ী পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাঁহার উদ্দেশ্য যতই সাধু ও উচ্চ হউক না কেন, আমার তাঁহার দ্বারা উপকারের অপেক্ষা অপকার হইবারই বেশী সম্ভাবনা। এ সকল বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভ্যাস যত পুরাতন তাহাকে নূতন ছাঁচে ফেলিতে হইলে তাহাতে তত বেশী বিপদ্। কিন্তু যদি কোন শিশু তাহার পুরাতন অভ্যাসের উপর নির্ভর করিয়া শ্বেতবর্ণকে মিষ্টস্বাদের অভ্রান্ত নিদর্শক বলিয়া চিন্তা করে, তাহা হইলে এ ক্ষেত্রে তাহার পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ও পুরাতন অভ্যাস দুঃখেরই কারণ হইয়া উঠে। কারণ জ্ঞানরাজ্যের বিশেষত্ব এই যে, সেখানে যাহা পুরাতন তাহাকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিলে চলে না; নূতন অতিথির জন্য অন্তরের দ্বার সর্ব্বদাই উদ্‌ঘাটিত না রাখিলে জ্ঞানের উপাসনায় সফলতা লাভ করা যায় না। যতদিন সেই এক দ্বন্দ্বাতীত সত্যের স্বরূপ আমার নিকট প্রকটিত না হয়, ততদিন আমি যদি আমার পূর্ব্ব সঞ্চিত রত্নরাজি প্রয়োজন হইলে নবাগত অতিথির চরণে উপঢৌকন দিতে না পারি, যদি কেবল পূর্ব্ব পরিচিত বস্তুর আকর্ষণে অভ্যাগতের অর্চ্চনা না করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জ্ঞানের উপাসনা বিড়ম্বনা মাত্র; কারণ আমার মায়ার পাশ এখনও কাটে নাই, আদর্শের জন্য যে একনিষ্ঠতা ও ব্যাকু-

লতা প্রয়োজনীয়, আমার মধ্যে তাহা এখনও দেখা দেয় নাই। সত্যজ্ঞানের যিনি প্রকৃত সাধক তিনি যেখানে বহুত্ব দেখিতে পান তাহাকেই মায়া বা ভুল বলিয়া পরিত্যাগ করেন, তা সে মায়া যতই পুরাতন হউক না কেন। যে জিনিষ সত্য সত্যই আট হাত, তাহা যদি কাহারও হাতের অনুপাতে সাত হাত, কাহারও নিকট সাড়ে সাত হাত, আবার কাহারও নিকট সাড়ে আট হাত লম্বা বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে এই বহু হাতের বহু ভাষার মধ্যে সত্যের স্বরূপ ধরিতে পারা যায় না। সেইজন্য জ্ঞানের সাধক আমিত্ব ও বহুত্বকে অতিক্রম করিয়া ঐ বিশ্বমূর্ত্তিকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করেন যাহাকে জানিতে পারিলে বহুকে মায়ামাত্র বলিয়া মনে হয়।

সত্যের এই বিশ্বপ্রেমিকতা যখন আমরা ভুলিয়া যাই, তখন জ্ঞানের রাজ্যেও নূতন পুরাতনের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া যায়। সেইজন্যই যখন পূর্ব্বগগনের আলোক প্রথমে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের উপর পড়িতে আরম্ভ করিল, তখন তাঁহারা ইহাকে অপরিচিত দেখিয়া অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। ভারত যে জ্ঞানের রাজ্যে কোন একটি আসন গ্রহণ করিতে পারে, তাহা তাঁহারা স্বীকার করিতেই পারিলেন না। কিন্তু এখন তাঁহাদের সে ভুল ভাঙ্গিয়াছে; তাঁহারা বুঝিয়াছেন যে, যে জগতে চিনি লবণ ও কুইনাইন সকলেই সাদা, সেখানে কেবলমাত্র বর্ণকে মূলমন্ত্র করিলে অজ্ঞানের অন্ধকার দূরকরা

যায় না। কেবলমাত্র বাইবেলের দোহাই দিয়া যদি পাশ্চাত্যজগৎ কোপার্নিকস্, নিউটন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নূতন চিন্তাপ্রণালীর মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন, তাহা হইলে আজ যে বহুমূল্যরত্নময় মহাসাগর বিশ্বকে স্তম্ভিত করিয়াছে তাহা অকালেই শুকাইয়া যাইত। তাই আজ তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন যে জ্ঞানের রাজ্যকে সাদা কালো, রাজা প্রজা, নূতন পুরাতন—এইরূপে বিভক্ত করা চলে না। এই কথাটি তাঁহারা সত্য বলিয়া মানিয়াছেন বলিয়া আজ আচার্য্য জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতি ভারতের মনীষিগণকে তাঁহারা উচ্চাসন না দিয়া থাকিতে পারেন না, আজ ভারত-কবি রবীন্দ্রনাথকে মেটারলিঙ্ক হইতে পৃথক করেন না, আজ মেঘনাদ সাহা প্রভৃতি ভারতীয় তপস্বীর গবেষণা? রাদার-ফোর্ড প্রমুখ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ সাদরে গ্রহণ করিতে-ছেন। যদি জ্ঞানের লক্ষ্য হয় ব্যক্তিত্বের ক্ষুদ্রগণ্ডীকে ভাঙ্গিয়া ফেলা ও বিশ্বের দ্বারে আতিথ্য স্বীকার করা, তাহা হইলে জ্ঞানের মন্দিরে যিনি উপাসনা করেন, তিনি আপনাকে বিশ্ব হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতে পারেন না। তাই মনে হয় আজ যেন পাশ্চাত্য জগৎ ভারতের আদ-র্শকে চিনিতে পারিয়াছে। আর আমরা যখন এখনও পশ্চিমের জ্ঞানপ্রবাহকে অবজ্ঞা করি, সেখানকার তপস্যাকে শূদ্রের তপস্যা বলিয়া অবমাননা করি, তখন যেন আমরা আমাদের সনাতন আদর্শটিকে ভুলিতে বসিয়াছি বলিয়া মনে

হয়। ভারতের জ্ঞানের আদর্শ ত আপন হইতে পরকে পৃথক্ করিতে বলে না। আমরা সাধারণ জীবনে ব্যক্তিত্বের পূজা করিতে পারি, আমরা আহারে ও বেশভূষাতে গোঁড়ামি দেখাইতে পারি, আমরা সামাজিক আচারে "অচল আয়তনের" উপাসক। কিন্তু আমাদের যে আদর্শ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে আদর্শকে ভারতের প্রাণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, সেই আদর্শবাণীর ঝঙ্কারে সকল কোলাহলের মাঝে এক সুর বাজে, এবং সেই তানের মোহিনী শক্তিতে "আমি" "তুমি"র ব্যবধান চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। ঐ ঝঙ্কারে কেবলমাত্র শুনিতে পাওয়া যায়—"সর্ব্বমস্মীতি উপাসীত, তদ্ব্রতম্, তদ্ব্রতম্"। আমরা যেন এই আদর্শ ভুলিতে বসিয়াছি। জাতীয় উন্নতির প্রেরণা আমাদের অন্তরের মাঝে এমনই একটা মোহজাল বিস্তার করিয়াছে যে জ্ঞানের রাজ্যেও আমরা প্রাচীর তুলিতে আরম্ভ করিয়াছি। দেশ, কাল, সমাজ, জাতি, বর্ণ, গোত্র, এ সকলের শৃঙ্খলে জ্ঞানের আলোক বদ্ধ থাকিতে পারে না। আমরা এই সহজ সত্যটি ভুলিয়া যাইতেছি বলিয়াই যেন আজ পাশ্চাত্যজগৎ আমাদের কানের কাছে সেই সনাতন অর্দ্ধবিস্মৃত রাগিণীর সুরটি বারংবার বাজাইয়া মনে করাইয়া দিতেছে যে তোমরা এই জাতীয় উদ্বোধনের দিনে তোমাদের জাতীয় সুরটি ভুলিও না; তোমাদের যে সুরটি আজ সমস্ত জগতের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছে, তাহার অমৃত-নির্ঝর হইতে নিজেদের

বঞ্চিত করিও না। তাই আমার মনে হয় যে এই বিদেশী-বর্জ্জনের দিনে পাশ্চাত্যচিন্তার আলোচনা ও পশ্চিমের তপস্যাকে সম্মান প্রদর্শন করা ভারতসন্তানের পক্ষে অগৌরবের কথা নয়।

পাশ্চাত্য চিন্তার ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে সেখানকার পণ্ডিতগণের বিচারে দর্শন কি, আর দার্শনিকের লক্ষণ কি, এবিষয়ে কিছু বলা দরকার। এস্থানে প্রথমেই একটি কথা নিবেদন করিয়া রাখি। আমরা সকলেই জানি যে একই সূর্য্যরশ্মি কাচ, স্ফটিক, মৃত্তিকা প্রভৃতি বিভিন্ন বস্তুতে পড়িয়া বিভিন্ন আকার ধারণ করে; স্ফটিকের নিকট সূর্য্যের যে রূপ ধরা পড়ে, মৃত্তিকার নিকট তাহা আশা করিতে পারা যায় না। সেই প্রকার, পাশ্চাত্য দর্শনের রূপ লেখকের চোখে যে ভাবে ধরা দিয়াছে, তাহাই এখানে বিবৃত হইবে, এবং অনুভূতির দোষে যদি দর্শনের স্বরূপ বিকৃত হইয়া থাকে তাহার জন্য লেখক ক্ষমার পাত্র।

আমরা যখন বিশ্বের স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করি, তখন দেখিতে পাই যে পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি বিশ্বাস আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে। এই বিশ্বাসগুলির মধ্যে আবার কতকগুলি এমনই প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে, তাহাদের শিকড় অন্তঃকরণের পরতে পরতে এমনইভাবে জড়াইয়া আছে যে, উহাকে তুলিয়া ফেলিতে গেলে

যেন বোধ হয় যে মর্ম্মের গ্রন্থিগুলিও ঐ সঙ্গে শিথিল হইয়া পড়িল; মনে হয় যেন আগাছা তুলিতে গিয়া কোন এক অন্তরতম প্রদেশের বহুদিনের সঞ্চিত রত্নগুলিকেও তুলিয়া ফেলিয়া দিতেছি। যেমন আমাদের বাহ্য জগতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস। ঐ যে গাছগুলি উন্নতশির হইয়া কত যুগ-যুগান্তরের ঘটনার সাক্ষী স্বরূপ ঐ স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এই যে সুবৃহৎ অট্টালিকা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর একই ভাবে এইখানেই অচল ও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া মানুষের সুখদুঃখের অনিত্যতাকে ফুটাইয়া তুলিতেছে, ঐ যে পশ্চিম গগনের মেঘের উপর নানাবর্ণের বিচিত্র খেলা আমাদের শান্তচিত্তে কি এক অনন্ত অনির্ব্বচনীয় গরিমার তরঙ্গ তুলিয়া দিতেছে—এই সকল প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ লইয়া এই যে দৃশ্যমান জগৎ আমাদের সম্মুখে বিরাজ করিতেছে ইহা এইভাবে ঠিক এই স্থানেই বর্ত্তমান থাকিবে, আমরা ইহাকে প্রত্যক্ষ করি আর না করি। আমরা যদি আজ একত্র হইয়া তাহাদের সম্বন্ধে কোন চিন্তাই না করিতাম তথাপি এই বস্তুগুলির বাস্তবতার কোনই পরিবর্ত্তন হইত না; ইহারা আমাদের বিরহে একটি ক্ষুদ্র নিঃশ্বাসও ত্যাগ করিবার প্রয়োজন বোধ করিত না। এটি যেন আমাদের প্রকৃতিগত বিশ্বাস। একটি অর্দ্ধবৃত্তের মধ্যে ত্রিভুজ আঁকিলে, তাহা যে সমকোণ হয়, ইহা শিক্ষা করিবার জন্য আমাদের স্কুলে

যাইবার দরকার হইতে পারে, কিন্তু এই প্রকার স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বাস বা জ্ঞানের জন্য শিক্ষক মহাশয়ের রক্তচক্ষু দেখিবার কিংবা বেত্রাঘাত্ত সহ্য করিবার দরকার মোটেই হয় না। শিক্ষিত অশিক্ষিত, হিন্দু মুসলমান, ভারতবাসী, ইংলণ্ডবাসী, সকলেরই মধ্যে এই সহজ সত্যগুলি যেন মজ্জাগত, হইয়া পড়িয়াছে। যদি কেহ বলেন, 'এই দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা, কিংবা এ বিশাল বিশ্ব তোমাদেরই দর্শন-সাপেক্ষ, তোমাদের মন ব্যতীত উহার আর দাঁড়াইবার স্থান নাই', তাহা হইলে আমরা যদিও প্রকাশ্যভাবে কিছুই না বলি, তথাপি অন্তরাত্মা যেন এই অদ্ভুত তথ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে থাকে। আমরা মনে মনে চিন্তা করি ইনি হয় পাগল, না হয় দার্শনিক। আবার অন্য কতকগুলি বিশ্বাস আছে যাহা মানুষের ধমনীর রক্তে রক্তে এমনভাবে মিলিত থাকে না। যেমন আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে, এবং বৃক্ষলতার অনুভব-শক্তি নাই। আমাদের এই স্বাভাবিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যদি কেহ বলেন যে ঐন্দ্রজালিক বিদ্যার প্রভাবে আগুনের শক্তি নষ্ট হইতে পারে, কিংবা যদি কোন বৈজ্ঞানিক বলেন যে বৃক্ষাদির জীবনও মানবজীবনের মতনই সুখ-দুঃখ ও হাসি-কান্নায় পূর্ণ, তাহা হইলে আমাদের মন পূর্ব্বের ন্যায় বিদ্রোহ ভাব ধারণ করে না। তেমনই আবার যদি কোন বৈদান্তিক ঘোষণা করেন যে, 'জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক,

বিশ্বের স্বরূপ এক নিরাকার অবাঙ্‌মনসগোচর অদ্বৈত চিন্ময় আত্মাকে চিন্তা করিতে গিয়া তুমি আকারবিশিষ্ট করিয়া ফেল ;' কিংবা যদি কোন সাধারণ দার্শনিক বলেন যে, 'তুমি যে দর্শনেন্দ্রিয়ের প্রমাণশক্তিতে বিশ্বাস করিয়া ঐ সম্মুখস্থ পদার্থটিকে টেবিল বলিয়া জানিতেছ, এবং ঐ বস্তুটিকে আম্রফল বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছ, তোমার সেই ইন্দ্রিয় বিশ্বাসঘাতক ; তোমার নয়ন দুইটি রূপের সাক্ষিমাত্র, সেইজন্য ঐ টেবিলের চিত্রটিকে বাস্তব টেবিল বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে, এবং ঐ আম্রফলের রূপ ও আকার বিশিষ্ট মৃৎপিণ্ডটিকে সত্য সত্যই আম্রফল বলিয়া প্রতারণা করিতেছে,' এই সকল উক্তির জন্য এবার আমরা আর পূর্ব্বের ন্যায় পাগলের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানটি দার্শনিকের জন্য নির্ব্বাচিত না করিতেও পারি। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আমরা যে সকল বিশ্বাস ও জ্ঞান লইয়া সাধারণতঃ জীবনের পথে চলা-ফেরা করি, তাহাদের সকলগুলিই যে কঠিন ছাঁচের মধ্যে পড়িয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে তাহা নয়। কতকগুলি বাস্তবিক এমনই শক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহাদের আকার পরিবর্ত্তন করিতে গেলে তাহারা একেবারেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। এখন দেখা যাক্ যে এই বিশ্বাসগুলির সৃষ্টিই বা হয় কেন, আর তাহারা যখন একবার একটি মূর্ত্তি লইয়া প্রকটিত হয়, তাহার পর ঐ প্রাকৃতিক আকারের পরিবর্ত্তন করিবার

প্রয়োজন হয় কেন।

এই সৃষ্টি ও পরিবর্ত্তনের মুখ্য কারণ পাওয়া যায় কেবলমাত্র জীবনের শাসনের মধ্যে। আমরা যে জগতে বাস করি তাহা একেবারেই অপরিচিত বা অজ্ঞাত হইলে সে স্থানে মুহূর্ত্তের জন্যও বাঁচিয়া থাকিতে পারিতাম না। পাণ্ডবেরা এক বৎসরের জন্য অজ্ঞাতবাস করিতে পারিয়াছেন তাহার কারণ এই যে বিরাট রাজার রাজ্যে তাঁহারা অজ্ঞাত ও অপরিচিত হইলেও সে রাজ্যটি তাঁহাদের নিকট সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিল না। যদি বাস্তবিকই বিরাট রাজ্যের সকল বস্তুই রহস্যকুহেলিকায় আচ্ছন্ন থাকিত, যদি সেখানকার স্বচ্ছনীর শরীরের ক্লান্তি দূর না করিয়া অবসাদ বৃদ্ধি করিত, যদি আহারের গুরুত্বের অনুপাতে বুভুক্ষিতের জঠরাগ্নি হু হু করিয়া জ্বলিয়া উঠিত এবং জলপানের সঙ্গে সঙ্গে পিপাসুর শুষ্ককণ্ঠ নীরসতর হইয়া যাইত; আর যদি ভীমের গদা সে রাজ্যে প্রবেশ করিয়াই নিজ প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া শোলার প্রকৃতি অবলম্বন করিত, তাহা হইলে কীচক বধ ত দূরের কথা পাণ্ডবগণ এই অদ্ভুত রাজ্যের মধ্যে ক্ষণকালের জন্যও অবস্থান করিতে পারিতেন না। জীবনের শাসন এমনই দুর্লঙ্ঘ্য, এমনই কঠিন! যে সকল বস্তুসমূহ আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, তাহাদিগের সহিত যদি আমরা সুপরিচিত হইতে না পারিতাম, যদি উহাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে

আমরা কোন প্রকার ভবিষ্যদ্‌বাণী করিতে না পারিতাম তাহা হইলে বিজ্ঞানের ত সম্ভাবনা থাকিতই না, অধিকন্তু যেটুকু জ্ঞানালোক না থাকিলে আমাদের জীবনপথের অন্ধকার দূর হয় না, সেই সাধারণ জ্ঞানের অভাবে এই জগতে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব হইত। এই যে জগতের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন, ইহার ধারা যদি আমরা একটু চিন্তা করিয়া দেখি, তাহা হইলে জানা যায় যে, এই পরিচয় একদিনে হয় না। আলাউদ্দীনের প্রদীপের নিকট মুহূর্ত্তের মধ্যে বিশাল অট্টালিকা প্রস্তুত সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু বাস্তব জগতের জ্ঞানমন্দির এভাবে রচিত হইতে পারে না। জ্ঞানের বিকাশ হয় ক্রমে ক্রমে, এবং ইহার সফলতা আসে বহু নিষ্ফলতার মধ্য দিয়া। ক্ষুদ্র শিশু যখন তাহার অট্টালিকাটি রচনা করে, তখন তাহাকে কতবারই গড়ান জিনিষ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়, কতই আশা নিরাশার ঘাত-প্রতিঘাত তাহাকে সহ্য করিতে হয়। জগৎটা যেন তাহার নিকট একটা প্রকাণ্ড হেঁয়ালি, এটা যেন কোন এক যাদু-করের দুর্ভেদ্য সম্মোহন মন্ত্রের দ্বারা প্রস্তুত যাদুঘর। তাহার সরল বিশ্বাস এখানকার কুহক ভেদ করিতে একেবারেই অক্ষম। একটি বস্তু তখনই তাহার সম্মুখে আসিয়া উপ-স্থিত হয়, আবার পরক্ষণেই কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। হাত পাগুলি যেন নিজের শাসনের বাহিরে, তাহারা নড়িয়া চড়িয়া কখনও তাহার তৃপ্তি সাধন করে, আবার কখনও

অসহ্য যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। কোন সময় ক্ষুধার দুঃখ অনুভব করিতে না করিতেই পরিতৃপ্তি, আবার কখনও গরিষ্ঠ আহারের কষ্ট না ফুরাইতেই পুনরায় আহার। যেন জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত কি এক অভাবনীয় জটিলতায় পূর্ণ। এক মুহূর্ত্ত তাহাকে যে শিক্ষা দেয় পরমুহূর্ত্তে তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলে। যতদিন শিশু জগতের রহস্য ভেদ না করিতে পারে, ততদিন আপনার সুখদুঃখের নিমিত্ত তাহার মাতা-পিতার উপর নির্ভর না করিলে চলে না। কিন্তু এমন পরমুখাপেক্ষী হইয়া বেশীদিন থাকা অসম্ভব। কলের ক্রীড়নকের কল টিপিয়া দিলেই সে নির্দ্দিষ্টভাবে কিছুক্ষণ চলিয়া থাকে, কিন্তু দম ফুরাইলেই, সে আবার অন্যের উপর নির্ভর করে। মানুষের কিন্তু আত্মনির্ভরতা না থাকিলে চলে না। সেইজন্য কিয়ৎ পরিমাণে বাধ্য হইয়া, এত বাধা বিঘ্ন স্বত্বেও শিশুকে জগতের কুহক ভাঙ্গিতে হয়। ধন্য তাহার উদ্যমকে, ধন্য তাহার অধ্যবসায়কে। তাহার অদম্য কৌতূহলের ফলে ঐন্দ্রজালিকের যাদুঘর ক্রমশঃই খুলিতে থাকে। তখন সে জানিতে পারে যে অগ্নির রূপ নয়নমুগ্ধকর হইলেও তাহার আলিঙ্গনে সুখ পাওয়া যায় না, শ্বেতবর্ণ কোন কোন সময় সুমিষ্ট স্বাদের পথপ্রদর্শক হইলেও তাহার সঙ্কেত সকল সময়েই অনুসরণ করিলে প্রতারিত হইতে হয়, জগতের যে সকল বস্তু পিতামাতার বাহ্যিক আবরণ ধরিয়া থাকে তাহারা সকলেই স্নেহভালবাসার

আধার হইতে পারে না। এখন হইতে কোন একটি বস্তুকে জানিতে হইলে সে আর একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের তোষা-মোদে প্রতারিত হইতে চায় না; একজনের কাহিনী অন্যের দ্বারা সংশোধিত করিয়া লয়, একটী ক্ষণের অভিজ্ঞতাকে অন্য ক্ষণের সঙ্কেত দিয়া পুষ্ট করিতে চেষ্টা করে, এবং আপনার অভিজ্ঞতা অপরের কষ্টি পাথরে কষিয়া দেখিতে চায়। এইরূপে ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়া সে নিজের জ্ঞান-মন্দিরটি এমনই ভাবে প্রস্তুত করিয়া লয় যে তাহার দৈন-ন্দিন জীবনের কাজকর্ম্ম উহার দ্বারা সুসম্পন্ন হইতে পারে। এই দৈনন্দিন জীবনের কাজ চালান জ্ঞানকে আমরা সাধারণ জ্ঞান বা ব্যাবহারিক জ্ঞান বলি। এই সাধারণ জ্ঞান ক্ষুদ্র শিশুর জ্ঞানের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর নয়, ইহা এক মুহূর্ত্তে বুদ্বুদের ন্যায় জলধির বুকে উঠিয়া পরমুহূর্ত্তে জলধিবক্ষে মিশাইয়া যায় না। এই সাধারণ জ্ঞানকে আমরা সত্য বলি তাহার কারণ ইহার এই অবিনশ্বরতা; বহুমুহূর্ত্তের মধ্যেও ইহার মূর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে, আর বহুব্যক্তির বহুত্বকে অতিক্রম করিয়া ইহা নিজের একত্ব বজায় রাখিতে পারে। তিন ও পাঁচে গুণ করিলে পনের হয়, ইহাকে আমরা সত্য বলি, তাহার কারণ, এই বহু রাশির ও বহুক্ষণের বহুত্বকে অতিক্রম করিয়া তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধটি এক ও অবি-নশ্বর থাকিয়া যায়। এই এক ও নিত্যসম্বন্ধটি অঙ্কশাস্ত্র-বিদের আরাধ্য বস্তু। জ্ঞানের লক্ষ্য যদি হয় সত্য, এবং

সত্যের লক্ষণ যদি হয় একতা ও নিত্যতা, তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে প্রকৃতজ্ঞান ব্যাবহারিক জ্ঞানেরও অনেক উপরে অবস্থিত। সাধারণ জীবনে যেটুকু আলোক না হইলে পথের অন্ধকার দূর হয় না, সেইটুকু আলো পাইলেই আমরা চরিতার্থ বোধ করি। আমরা জানি যে অগ্নির স্পর্শে যন্ত্রণা হয়, তাহার শক্তিতে খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়, এবং তাহার উত্তাপে শীতের কষ্ট দূরীভূত হয়। অগ্নি সম্বন্ধে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমরা সাধারণতঃ আর কিছুই জানিবার জন্য ব্যগ্র হই না। কিন্তু যখন মানুষের জ্ঞানপিপাসা ব্যাবহারিক জীবনের প্রয়োজন গুলিকে অতিক্রম কয়িয়া উঠে, যখন সে কেবলমাত্র শয়ন এবং ভোজন করিয়া তৃপ্ত থাকিতে পারে না, তখন যে মন্দিরটি কত দিনের কত সাধনার ফলে খাড়া হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে সে পুনরায় পর্য্যবেক্ষণ করিতে আরম্ভ করে। যে বিশ্বাসগুলি কতকটা জীবনের শাসনে, আর কতকটা দিদিমার গল্প ও মাষ্টার মহাশয়ের কর্ত্তব্যব্যাখ্যা হইতে মনের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে, নিজের অন্তরাত্মার স্পন্দনের সহিত সে-গুলির কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহা বুঝিবার নিমিত্ত একটা আগ্রহ জন্মিয়া উঠে। যে সময়ে মানুষের অন্তঃকরণে এই বিশুদ্ধ জ্ঞানপিপাসা উৎকট হইয়া উঠে, তখন হইতে তাহার দার্শনিক জীবন আরম্ভ হয়। এখন হইতে সে জ্ঞানকে কেবল জ্ঞানের জন্যই উপাসনা করে; আর সত্যকে

কেবল সত্যের জন্যই ভালবাসে।

এই যে সত্যের প্রতি বিশুদ্ধ অনুরাগ ইহার অভিব্যক্তির জন্য অনেকগুলি উপাদানের দরকার, যে উপাদান সমূহের অভাবে আমাদের অনেকের মধ্যেই ইহার স্ফুরণ হইবার সুযোগ হয় না। কিন্তু যদি একবার এই সত্যানুরাগের বীজ রোপিত হয়, সে ক্রমে ক্রমে নিখিলপ্রাণের উপর এমনই একটা আধিপত্য বিস্তার করে যে এখন হইতে মনে হয় যেন জীবন-নাটকের একটী নূতন অঙ্কের আরম্ভ হইল। এখন আর জ্ঞানকে জীবনের দেনা পাওনার হিসাবের সহিত খতাইয়া দেখিবার দরকার হয় না। ভগবান্ সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস কেমন হইলে সকলেই আমায় প্রকৃত হিন্দু ও ব্রাহ্মণকুলধুরন্ধর বলিবেন, বিশ্ব সৃষ্টি সম্বন্ধে কোন মতটি বিশ্বাস করিতে পারিলে আমায় দেখিয়া কেহ অধার্ম্মিক বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন না, আহার ও আচার বিষয়ে আমার বিশ্বাস কি প্রকার হইলে আমার পুত্র কন্যার বিবাহোৎসবের কোন ব্যাঘাত হইবে না—এই প্রকার জ্ঞানের সহিত যেখানে ব্যাবহারিক জীবনের সম্বন্ধ, কেবলমাত্র সেইটুকু জানিয়াই আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারা যায় না। এখন হইতে আমাদের লক্ষ্য হয় কেবলমাত্র একমেব অদ্বিতীয়ম্। তখন একবার ঐ পূর্ব্ব রচিত জ্ঞানমন্দিরটির দিকে চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে তাহার অনেক স্থানই অতি অশক্ত, বৃষ্টি বা ঝঞ্ঝাবাতের স্পর্শমাত্রেই উহা ভাঙ্গিয়া

পড়িতে পারে। তখন স্পষ্টই জানা যায় যে আমাদের "ভাঙ্গাগড়া"র কাজ এখনও শেষ হয় নাই। যে সত্যে আমরা এপর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছি, তাহা কতকটা সময় ও সংখ্যার অতীত হইলেও তাহাতে চরমসত্যের লক্ষণগুলি পাওয়া যায় না। সত্যের যে অবিনশ্বরতা ও সার্ব্বভৌমিকতা তাহা আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের জ্ঞানে পাওয়া যায় না বলিয়াই, দার্শনিক ইহার সীমাকে অতিক্রম করিতে বাধ্য হন। সাধারণ মানুষ ও দার্শনিকের মধ্যে এইস্থানেই পার্থক্য। সাধারণতঃ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের ক্রীতদাস। সেইজন্য আমাদের যুক্তিলব্ধ বিশ্বাস, ও সামাজিক ব্যবহারের মধ্যে গরমিল বা অসামঞ্জস্য থাকিলেও তাহার নিরাকরণের জন্য আমরা ব্যস্ত হইয়া পড়ি না। কলেজে কিংবা টোলে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা প্রমাণ করিয়া যখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করি, তখন আবার চোরের চৌর্য্য-বৃত্তির জন্য এবং নরহন্তার নৃশংসতার জন্য তাহাদিগকে শাস্তিপ্রদানের ব্যবস্থা করি। ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতা ও মানুষের নিজ দুষ্কৃতির জন্য দায়িত্ব, এই দুইটির মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য আছে কিনা, আর যদি থাকে তাহা হইলে এই বিরোধের কোনও প্রকার প্রতীকার হইতে পারে কি না, ইহা চিন্তা করিয়া না দেখিলেও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কোন বিঘ্ন হয় না। জাগ্রতাবস্থায় যাহা অসম্ভব তাহা যদি স্বপ্নরাজ্যে সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে এই দুই রাজ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহার স্বরূপ নির্ণয় না করিলেও বাস্তবজীবনে কিছু যায় আসে

না। একটী লোক আফিংএর নেশায় বা জ্বরের বিকারে যে সকল বস্তু স্পষ্ট দেখিতে পায় তাহা সাধারণতঃ নয়ন-গোচর হয় না বলিয়াই এইগুলিকে ভ্রম বলা হয় কেন, এবিষয়ে গবেষণা না করিলেও আমা-দের আহার বিহারের কোনই ত্রুটি হয় না। সেইরূপ আবার সরকার বাহাদুরের সঙ্গে সহযোগিতা বর্জ্জন ন্যায়-সঙ্গত কিনা, এবিষয়ে আমাদের মতভেদ থাকিতে পারে; যে বস্তুটি আমার নিকট সৌন্দর্য্যের আকর, অন্যের নয়নে তাহা কুৎসিত হইতে পারে; একজন যাহাকে পাপ বলিয়া পরিহার করেন, অন্য একজন তাহাকে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া বরণ করিতেও পারেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে আমাদের সাধারণ জীবন বহুপ্রকারেই অসঙ্গতিদুষ্ট। কিন্তু এই অসঙ্গতি ও অনৈক্য থাকা সত্ত্বেও দৈনন্দিন জীবনের কোন হানি হয় না। তৃষ্ণার সময় জল চাহিলে যদি কেহ আমায় লেমনেড আনিয়া দেন তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না, কিন্তু "একটু পানীয় দেন" বলিলে যদি কেহ মদ্য আনিয়া উপস্থিত করেন, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা তখন আর উপেক্ষা করা যায় না। যে জ্ঞানের মধ্যে এতখানি অসম্পূর্ণতা, তাহাকে লইয়া আর জীবনের কাজকর্ম্ম চলিতে পারে না। যতক্ষণ একটি অসঙ্গতির নিরাকরণ বা একটি সমস্যার সমাধান না করিলেও সাধারণ জীবনের কোন হানি হয় না, ততক্ষণ

আমরা আর বৃথা মাথা ঘামাইবার ইচ্ছা করি না। কিন্তু যিনি দার্শনিক তাঁহার নিকট এই দ্বন্দ্ব ও বিরোধ বড়ই অপ্রীতিকর। সাধারণতঃ আমাদের পক্ষে বহির্জ্জগতের দ্বন্দ্ব যেমন অশান্তিকর, তাঁহার পক্ষে অন্তর্জ্জগতের বিরোধও তেমনই কষ্টকর। সলিল যদি প্রতি মুহূর্ত্তেই নিজের প্রকৃতি পরিত্যাগ করিয়া কখনও বা অনিলের এবং কখনও বা অনলের ধর্ম্মকে গ্রহণ করে. তাহা হইলে যেমন আমাদের জীবন দুর্ব্বিষহ হয়, তেমনি জ্ঞান ও বিশ্বাসরাজ্যে যতক্ষণ বিদ্রোহের লক্ষণ থাকে, ততক্ষণ দার্শনিকের জীবনও তাঁহার নিকট অশান্তিকরই হইয়া থাকে ; বিরোধ ও বহুত্বের করালমূর্ত্তি তাঁহার প্রাণে অশান্তির সঞ্চার করে বলিয়াই তিনি বহু ইন্দ্রিয়ের বহু ভাষা ও নানালোকের নানাকথার গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া সেই এক সনাতন সত্যের দ্বারে পৌঁছিবার জন্য ব্যস্ত হন যেখানে বিরোধের কোলাহল, ও বহুত্বের ভীষণ মূর্ত্তি পৌঁছিতে অক্ষম, যেখানে এক দ্বন্দ্বাতীত শান্ত, শিব, সুন্দরকে পাইয়া তাঁহার সকল প্রকার দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও অশান্তির অবসান হয়।

দার্শনিকের এই আদর্শটিই একমাত্র লক্ষ্য, এবং ইহার মোহনমূর্ত্তি চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া ও তাহাকে কল্পনার নয়নে দেখিতে পাইয়াই তিনি পাগল হইয়া পড়েন। এইটিই তাঁহার আসল পাগলামি। সেইজন্য যতক্ষণ অন্তরের সকল তারগুলি মিলিত হইয়া একটি ললিত ঝঙ্কার না তোলে,

ততক্ষণ তিনি কেবলই তানপুরার কান টিপিতে থাকেন, এবং অনেকের পক্ষেই সেটা আদৌ আনন্দদায়ক হয় না। ঐ আদর্শ রাগিণীর ঝঙ্কার তুলিতে গিয়া কতকগুলি তন্ত্রী ছিঁড়িয়া যায়, আর কতকগুলি সাধারণ কানে বেসুরো বাজে, তাই তাঁহার সাধনার ফল সাধারণ কানে পাগলের অসম্বদ্ধ প্রলাপ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এইবার আমরা দর্শন ও দার্শনিকের লক্ষণ এক কথায় এই বলিতে পারি যে, দার্শনিক চিন্তা অদ্বিতীয়, এবং দেশ, কাল ও সংখ্যার দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সনাতন, সত্যের উপাসনা, আর যিনি ঐ আদর্শের সার্থকতার জন্য জীবনের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সমস্তই পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন না, তিনিই দার্শনিক।

এই আদর্শকে লক্ষ্য করিয়া পশ্চিমের চিন্তাস্রোত কোন পথ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা যখন আমরা নির্ণয় করিতে চেষ্টা করি, তখন মনে হয় যেন বাস্তবিকই একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী পাশ্চাত্য দেশের একটি প্রান্ত হইতে আত্মপ্রকাশ করিয়া নানাস্থানে প্রায় আড়াই হাজার বৎসর যাবৎ ঘুরিয়া ঘুরিয়া সমস্ত বিশ্বের মধ্যে এমনই ভাবে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন আর সে কোন দেশ বা প্রদেশের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে চায় না। সর্ব্বত্রই দেখা যায় তার অবারিত গতি, সকল দেশেই শোনা যায় তার কলকল ধ্বনি।

খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে যখন মহামতি

থেলিস (Thales) জীবনের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে জ্ঞানকে মুক্ত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, তখন তাঁহার চিন্তা-স্রোত একটি মাত্র ধারা লইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। জগতের পরিবর্ত্তনশীলতা দেখিয়া তাঁহার মনে খট্‌কা বাধিল, তিনি নিজেকে প্রশ্ন করিলেন, "এই নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল জগতের মধ্যে কোন বস্তুটি শাশ্বত থাকে ?" পাশ্চাত্য দেশে এই প্রথম বহুর মধ্যে একের অন্বেষণ, এবং নশ্বরের মধ্যে অবিনশ্বরকে জানিবার জন্য দার্শনিক প্রয়াস আরম্ভ হইল। এই আদি সমস্যার সমাধান করিতে গিয়া বহু দার্শনিক বহু কথা বলিলেন, এবং তাহার ফল হইল এই যে একটি প্রশ্নের মধ্য দিয়া আর একটী প্রশ্নের উদ্ভব হইতে লাগিল। পরিবর্ত্তনের মাঝে যেটি নিত্য থাকে, তাহার স্বরূপ কি ? এই নিত্য বস্তু হইতে অনিত্য বস্তুর সৃষ্টি হয় কেমন করিয়া ? ঐ নিত্য বস্তুর মধ্যে সংখ্যার স্থান আছে কি না ? কোন পথ দিয়া এই বস্তুর সমীপে উপস্থিত হইতে পারা যায় ?—এই প্রকারে একটি সূর্য্যরশ্মি যেন পাশ্চাত্য তরঙ্গে পড়িয়া তাহার অন্তর্নিহিত বহুবর্ণকে প্রকাশ করিতে লাগিল ; আর এই বর্ণবিশ্লেষণের মধ্য দিয়া মানুষের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতে লাগিল।

এইটিই দর্শনশাস্ত্রের সমস্যা ও মতদ্বৈধের বিশিষ্টতা। যখন একটি সমস্যা হইতে অন্য একটি সমস্যার সৃষ্টি হয়, এবং তাহাদের সমাধান করিতে গিয়া দার্শনিক মত বিভক্ত হইয়া পড়ে,

তখন এই বিভাগের প্রকৃত কারণ মানুষের খেয়াল কিংবা শিক্ষাবৈচিত্র্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। এখানে প্রশ্নের মধ্য দিয়া মানুষ নিজেকে চিনিতে শেখে, এবং নূতন প্রশ্নের সৃষ্টি তখনই হয় যখন তাহার অন্তরের বিভিন্ন দিক্ বিভিন্ন প্রকারের দাবী আনিয়া উপস্থিত করে। এ যেন কতকটা আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধের মত। তার বুদ্ধি যে আদর্শকে উপাসনা করে, তার হৃদয় সে আদর্শকে অর্ঘ্য দিতে চায় না, ইন্দ্রিয় যাহাকে সত্য বলিয়া পরিচয় দেয়, তার অন্তরাত্মা তাহাকে ধ্রুব বলিয়া বরণ করেনা। জ্ঞান একের মধ্যে নিজের সার্থকতা খুঁজিয়া বেড়ায়, কিন্তু ভক্তি তুই না হইলে চরিতার্থ হইতে পারে না। বুদ্ধি-দৃষ্টিতে, বহু তখনই কৃতার্থ হইতে পারে যখন সে আপনার বলিয়া কিছুই রাখে না। সাধক যখন তার আরাধ্যদেবের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করিয়া দিতে পারে, যখন তাহাদের মধ্যে কোনই ব্যবধান আর থাকে না—তখনই সাধনার চরম উৎকর্ষ। কিন্তু হৃদয়ের আদর্শ ঠিক এমন নয়। ভক্তি-দৃষ্টিতে একের সমস্ত মনপ্রাণ অন্যের চরণে নিবেদন করিয়াও এই আত্মনিবেদনের আনন্দটুকু অনুভব করিবার জন্য তুইএর মধ্যে অন্ততঃ একটি ময়ূরপুচ্ছের ব্যবধান না রাখিলে চলে না। এই ভাবে অন্তরের বিভিন্ন দিকের বিভিন্ন প্ররোচনায় যখন অন্তঃকরণ দ্বিখণ্ড, হইয়া পড়ে তখন দর্শনশাস্ত্রও জটিল হইয়া, উঠে।

যখন গ্রীস ও রোমদেশের চিন্তা কেবল জ্ঞানের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল, তখন তার স্রোতধ্বনিতে অন্তরের আর একটি প্রদেশ মুখরিত হইয়া উঠিল। এই নূতন প্রদেশের নূতন কাহিনীর অভিব্যক্তি হইল, খ্রীষ্টান ধর্ম্মের যাজকদের মধ্যে। এইবার অন্তরের এক দেশের সহিত অন্য দেশের তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কেহ বলিলেন যে কেবল যুক্তি ও চিন্তাশক্তির দ্বারা সত্যকে ধরা অসম্ভব, কারণ যে মনুষ্য নিজ দুষ্কৃতির ফলে অসীম হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে তাহার বুদ্ধি ও চিন্তা সসীমের স্পর্শে বিকারগ্রস্ত, সুতরাং সত্যের রাজ্যে পৌঁছিতে হইলে তার পক্ষে চাই বিশ্বাস, চাই শ্রদ্ধা। আবার কেহ বলিলেন যে জ্ঞানের আলো না থাকিলে অন্ধবিশ্বাসের তমসা দূর হইতে পারে না, সুতরাং যুক্তি ও চিন্তাকে বাদ দিলে সত্যকে ধরিতে পারা একেবারেই অসম্ভব। যখন পশ্চিম গগন এই যুদ্ধ-প্রসূত ধূলিকণায় সমাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল, যখন এই আভ্যন্তরিক বিরোধের ফলে বাহ্যজগতে অনেক স্থানে রক্তপাতও হইতে লাগিল, তখন কেহ কেহ আবার প্রমাণ করিয়া দেখাইতে লাগিলেন যে এই আন্তর্জাতিক যুদ্ধের ভিত্তি আমাদের কপোলকল্পিত মাত্র। ভক্ত যে বস্তুকে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার দ্বারা পাইতে চেষ্টা করেন, জ্ঞানী সেই বস্তুকেই চিন্তা ও তর্কবিতর্কদ্বারা ধরিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং যে

তত্ত্ব প্লেটো, অ্যারিষ্টটল্ প্রভৃতি যুক্তিসর্ব্বস্ব দার্শনিকগণের চিত্ত-দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল খ্রীষ্টানধর্ম্মও ঠিক সেই তত্ত্বের উপ-রেই দাঁড়াইয়া আছে। ইউরোপের মধ্যযুগের দার্শনিকগণ অন্তরের এই বিরোধ মিটাইতেই ব্যস্ত থাকিলেন।

তেমনই আবার ইন্দ্রিয় ও যুক্তির বিরুদ্ধদাবীর ফলে দর্শন-শাস্ত্রের সমস্যাগুলি জটিলতর হইয়া পড়ে। যে বস্তু ! আমরা স্পষ্টরূপে ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা জানিতে পারি, যাহাকে আমরা হস্ত-দ্বারা স্পর্শ করি, নয়ন দিয়া দর্শন করি, তাহাকেই সাধারণতঃ সত্য বস্তু বলিয়া থাকি। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান ব্যতীত আর যে কোনপ্রকার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হইতে পারে, তাহা আমরা বিশ্বাস করিতেই পারি না। সেইজন্য আমরা সাধারণতঃ মনে করি "ইন্দ্রিয়ের সীমানা অতিক্রম করিলেই মানুষের চিন্তা কেবল আকাশকুসুম কিংবা কবিকল্পনা মাত্র।" এই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই যাঁহাদের চরমলক্ষ্য, তাঁহাদিগকে বৈজ্ঞা-নিক আখ্যা দেওয়া হয়। বৈজ্ঞানিক বলেন যে, চিন্তাকে অস্পষ্টতা ও সন্দেহকোয়াসা হইতে মুক্ত করিতে পারে, একমাত্র ইন্দ্রিয়ের রশ্মি। তাঁহার নিকট ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু তাহাই যাহা ইন্দ্রিয় এখনও প্রকাশ করিতে পারে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া এমন কোন তত্ত্ব তিনি স্বীকার করিতে পারেন না যাহা ইন্দ্রিয়ের নিকট ধরা পড়ে না। সেইজন্য যখন বৈজ্ঞানিকযন্ত্রের শক্তিতে কত শত অজানা বস্তু ইন্দ্রিয়ের কাছে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন বৈজ্ঞানিক এই

নূতন আবিষ্কারের উন্মাদনায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠি-লেন—"আমি সমস্ত আকাশ দূরবীক্ষণ দিয়া তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলাম, কিন্তু কোথাও ঈশ্বর নামে কোন বস্তুকে দেখিতে পাইলাম না ; অতএব ঈশ্বর মানুষের কল্পনার রাজ্য ব্যতীত অন্য কোনও স্থানে থাকিতে পারেন না।" কিন্তু যাঁহারা অন্তঃকরণের প্রেরণা ও হৃদয়ের আদর্শকে ইন্দ্রিয়ের উপরে স্থান দেন, তাঁহারা এই ইন্দ্রিয়প্রকাশ্য জগৎ ছাড়া আর একটা ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সত্ত্বা মানিতে বাধ্য হন। তাঁহারা বলেন যে, ইন্দ্রিয় কেবল বস্তুর বাহ্যিক আবরণ মাত্র প্রকাশ করে, ইন্দ্রিয়ের বহুভাষাকে অতিক্রম করিয়া *বস্তুর সনাতন সত্যকে ধরিতে হইলে, চাই আর একটী শক্তি।* রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান দ্বারা বস্তুর জ্ঞান হয় না, কারণ এগুলি বহু কিন্তু বস্তু এক। তেমনি আবার ইন্দ্রিয় আমাদের যে জ্ঞান দেয়, তাহাতে বিরোধের বিনাশ হয় না, সেইজন্য এক বস্তুগত উত্তাপকে নানা লোকে নানা ভাবে অনুভব করে। সুতরাং বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের সহিত পরিচয় কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা হইতে পারে না। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য মনে করি, তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইতে হইলেও একটি ইন্দ্রিয়াতীত সত্ত্বা মানিতে হয় ; আর ঐ ইন্দ্রিয়াতীত সত্ত্বা না থাকিলে, বৈজ্ঞানিক যে আদর্শকে এই ইন্দ্রিয়প্রকাশ্য জগতে অন্বেষণ করিতেছেন সে আদর্শ তাঁহাকে অনু-

প্রাণিত করিতে পারিত না। সুতরাং এই ইন্দ্রিয়-প্রকাশ্য জগৎ ব্যতীত আর একটি রাজ্য আছে, যেখান হইতে আইসে ধর্ম্মের প্রেরণা, নীতির কঠোর শাসন ও কর্ত্তব্যের আহ্বান। মানুষের যে অমৃতপিপাসা, আদর্শের চরণে আত্মবলিদান, নিরাশার মাঝে শান্তিসুধার আস্বাদ, এগুলি ঐ ইন্দ্রিয়াতীত অন্তরতম জগতের প্রেরণার ফল। এই জন্য পাশ্চাত্য চিন্তায় বিজ্ঞানের সঙ্গে পরাবিজ্ঞানের একটা চিরকালের বিরোধ দেখা যায়।

এই সকল অন্তরের বিরুদ্ধ প্রেরণার সমস্যা ও তাহাদের সমাধানের বৈচিত্র্য ক্রমে এতই বাড়িয়া গেল যে, একজন মানুষের পক্ষে নিখিল সমস্যার আলোচনা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন জ্ঞানের রাজ্যে একটি সীমান্তসূচক রেখা টানিবার প্রয়োজন হইল। তাহার একদিকে বিজ্ঞানের রাজ্য, আর একদিকে দর্শনের রাজ্য। তাই এখন আর প্রত্যেক চিন্তাপ্রবাহকে দার্শনিক চিন্তা বলা হয় না। বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বকে বহু অংশে বিভক্ত করিয়া তাহাকে বহুদিক্ দিয়া জানিতে চেষ্টা করেন। এই এক একটি দিক্‌কে পরিষ্কারভাবে জানিতে গিয়া এক একটি বিজ্ঞানের সৃষ্টি হয়। সুতরাং একটি বিজ্ঞান বিশ্বের অনন্ত দিকের একটিমাত্র দিক্‌কে চিত্রিত করিতে চেষ্টা করে। এবং এইভাবে রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা প্রভৃতি নানা বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই ইন্দ্রিয়প্রকাশ্য জগতের জ্ঞান সম্বন্ধে এখন দার্শনিকের

কর্ত্তব্য কেবলমাত্র বহু বিজ্ঞানের বহু চিত্রের মাঝে যাহাতে একই বিশ্বের প্রতিকৃতি বজায় থাকে তাহার পথ দেখাইয়া দেওয়া। দার্শনিক কেবল বৈজ্ঞানিককে মনে করাইয়া দেন যে, এই সকল বিশ্বচিত্র ভিন্ন ভিন্ন হইলেও বিশ্বটি কিন্তু এক, সুতরাং একটি বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও অন্য একটি বিজ্ঞানের তত্ত্বের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য বা বিরোধ থাকিলে বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপ প্রকটিত হইতে পারে না। আবার বৈজ্ঞানিক যে সকল সত্য আবিষ্কার করেন, তাহারা কতকগুলি স্বীকৃত সত্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, এইগুলিকে তাঁহারা চরমসত্য বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হন। সুতরাং বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণক্রিয়া যখন এই সকল চরমসত্যে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর তাঁহারা অগ্রসর হইবার দরকার বিবেচনা করেন না। তখন বৈজ্ঞানিকের নিকট হইতে দার্শনিক ঐ স্বীকৃত-সত্যগুলিকে লইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বুঝিতে চেষ্টা করেন। সুতরাং বিজ্ঞানের কথা যেখানে শেষ হয়, দর্শনের কাজ সেখানে আরম্ভ হয়।

বোঁটা হইতে একটি ফল খসিয়া পড়িল, অমনই মহামতি নিউটন্ জিজ্ঞাসা করিলেন, বৃক্ষ হইতে ফলের বৃন্তচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িবার কারণ কি? খুঁজিতে খুঁজিতে প্রশ্নের উত্তর আসিল এই যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলিয়া একটি আকর্ষণী শক্তি আছে, উহার প্রভাবে জড়পদার্থকে সে নিজের কেন্দ্রের অভিমুখে টানিয়া আনে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু মন আবার প্রশ্ন

করিল, পৃথিবীর এ শক্তির কারণ কি ? বহু গবেষণা ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে ইহার উত্তর পাওয়া গেল এই যে, সমস্ত জড়জগৎ ব্যাপিয়া একটি আকর্ষণী শক্তি আছে, এই শক্তির ফলে জড়পদার্থগুলি পরস্পরকে সর্ব্বদাই আকর্ষণ করে। কিন্তু এই শক্তি বস্তুর দূরত্ব ও পরিমাণের তারতম্য অনুসারে কম বা বেশী হয় বলিয়া সর্ব্বত্রই ইহা সমানভাবে প্রকাশ পায় না। এই জগদ্ব্যাপী বিশ্বনিয়মের দ্বারা নিউটন্ গ্রহ উপগ্রহের আকাশে পরিভ্রমণ, তাহাদের নিজ নিজ কক্ষে অবিচলিত ভাবে পরিক্রমণ প্রভৃতি অনেক জটিল সমস্যার উত্তর দিলেন।

এখন আমরা এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণক্রিয়াটির প্রতি একটু মনোযোগ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারি যে নিউটন্ কতকগুলি তত্ত্বকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। এবং তাঁহার বস্তুবিশ্লেষণ একস্থানে আসিয়া সহসা থামিয়া গিয়াছে। তিনি মানিয়া লইয়াছেন যে জগতের প্রত্যেক ঘটনারই একটা কারণ আছে. জড়জগতের সমস্ত ঘটনা কতকগুলি নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সেই নিয়মগুলি আবহমান কাল হইতে একই ভাবে জাগতিক বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছে, ইত্যাদি। দার্শনিকের চিত্ত কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে এইটুকু জানিয়াই সন্তুষ্ট হয় না। তিনি প্রশ্ন করেন— কারণ বস্তুটি কি ? এই কারণ ও কার্য্যের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আমরা বিশ্বাস করি কেন ? জড়ের প্রকৃত স্বরূপ কি ? তাহার

সঙ্গে চৈতন্যের কি সম্বন্ধ ? ইত্যাদি। যে সকল চরম সত্যকে বিজ্ঞান নিজের ভিত্তিরূপে ব্যবহার করে, যাহার উপরে বিজ্ঞানের সকল সফলতা নির্ভর করে, সেইগুলিই দর্শনের আলোচ্য বিষয়। আর ঐ ভিত্তি যদি দৃঢ় না হয় তাহা হইলে বৈজ্ঞানিকের বহু শতাব্দীর সাধনা একটি আঘাতে নিষ্ফল হইয়া যায়। এই নিষ্ফলতার একটি উজ্জ্বল সাক্ষী আধুনিক গণিতশাস্ত্র। ইউক্লিড্ আকাশ সম্বন্ধে যে তত্ত্বকে মানিয়া লইয়া তাহার উপর জ্যামিতি অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আজ জার্ম্মান্ প্রদেশের আইন্ষ্টাইন্ নামক একজন জ্ঞানতাপস ইউক্লিডের তত্ত্বকে আর সত্য বলিতে চান না। ইহার ফলে সমস্ত জ্যামিতি-শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে চলিয়াছে। ত্রিকোণের তিনকোন ১৮০ ডিগ্রী বলিলে আর চলিবে না, দুইটি সমান্তরাল সরলরেখা কখনও মিলিতে পারে না বলিলে এখন ভুল বলা হইবে।

দার্শনিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি কেবলমাত্র মানিয়া লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না কেন তাহা আমরা মোটামুটি পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। তিনি সর্ব্বত্রই একটি আদর্শকে খুঁজিয়া বেড়ান। এই আদর্শটি আমাদের জীবনের সাধারণ জ্ঞানে যেটুকু অভিব্যক্ত হয়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রকাশ পায়। কিন্তু বিজ্ঞান ও তাহাকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিফলিত করিতে পারেনা।

এই আদর্শ জিজ্ঞাসু অন্তঃকরণের চরমপরিতৃপ্তি। আর এই পরিতৃপ্তি আসিতে পারে তখনই, যখন সেই তত্ত্বকে জানিতে পারা যায়, যাহা দেশ কাল বা উপাসক ভেদে বিভিন্ন হয় না, যাহা সকল পরিবর্ত্তনের মাঝে অবিনশ্বর ও বহুভাষার মধ্যে এক থাকে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যখন কোন একটি বস্তুকে জানিতে বাধ্য হই, বৈজ্ঞানিক যখন সেই বস্তুকে আরও বিশিষ্টভাবে জানিতে চেষ্টা করেন, এবং দার্শনিক যখন ঐ বস্তুকেই বুঝিতে গিয়া বিজ্ঞানের গণ্ডীকেও অতিক্রম করেন, তখন একই আদর্শ সকলকেই অনুপ্রাণিত করে, কেবল উহার অভিব্যক্তির পরিমাণ অনুসারে সাধারণজ্ঞান, বৈজ্ঞানিকজ্ঞান ও দার্শনিক জ্ঞান পরস্পর হইতে পৃথক হয়।

এই প্রবন্ধ পাঠের সময় যদি সহসা একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়া আমরা ঘর !হইতে বাহির হইয়া দেখি যে অসহযোগনীতি দমন করিবার জন্য একদল সৈন্য স্বেচ্ছাসেবকের উপর গুলি চালাইবার উদ্যোগ করিতেছে, তাহা হইলে আমরা অনেকেই আত্মানং সততং রক্ষেৎ এই শাস্ত্রানুশাসনকে অকাট্য সত্য ভাবিয়া এখান হইতে দূরে যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিব। ইহার কারণ এই যে বন্দুকের গুলি ও আমাদের প্রাণ এই দুইটির মধ্যে কি সম্বন্ধ তাহা আমরা জানি। বন্দুক হইতে গুলি নিষ্কাশনের শব্দ ও বেহাগ রাগিনীর

সুরের মধ্যে কি পার্থক্য, তাহা জীবন রক্ষার জন্য জানা দরকার। বৈজ্ঞানিক কিন্তু শব্দ সম্বন্ধে এইটুকু জানিয়া তৃপ্ত হন না। তিনি দেখেন যে, যে বন্দুকের শব্দ এখন শোনা গেল সেই বন্দুক আবার যে ঘর হইতে বায়ু নিষ্কাশিত করা হইয়াছে সে ঘরের ভিতর আওয়াজ করিলে তাহা বাহির হইতে শোনা যায় না। এই প্রকার শব্দ বিষয়ক জ্ঞান হইতে অসঙ্গতি দূর করিতে গিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে শব্দ বলিয়া কোন বস্তু বহির্জগতে নাই। ইহার এক মাত্র স্থান মনের মধ্যে। বহির্জগৎ হইতে বায়ুতরঙ্গ কর্ণপটাহে আঘাত করে, সেই আঘাতের ফল মস্তিষ্কে পৌঁছিয়া শব্দজ্ঞান উৎপন্ন করে। এই ভাবে বস্তুবিশ্লেষণ করিতে করিতে বৈজ্ঞানিক এই সত্যে উপনীত হন যে সমস্ত জড়জগৎ কেবল কতকগুলি অনাদি অবিনশ্বর, জড়পরমাণু ও তাহাদের তাণ্ডব নৃত্য ভিন্ন আর কিছুই নয়।

ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, দৈনন্দিন জীবনের সাধারণজ্ঞানের বিরোধ নষ্ট করিয়া জ্ঞানের রাজ্যে একতা স্থাপন করিতে গিয়া বিজ্ঞানের উৎপত্তি হয়। সাধারণজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য এই যে জ্ঞানের যেটুকু একতা ও সাম্যতা জীবনের জন্য প্রয়োজন, বিজ্ঞান সেইটুকুতে সন্তুষ্ট হয় না। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে ঐ একত্বের আদর্শটি আরও পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া

উঠে। দার্শনিক কিন্তু এখানেও আদর্শজ্ঞানের সম্পূর্ণ অভিব্যক্তি দেখিতে পান না। তিনি চান অন্তরের নিখিল বিরোধের আত্যন্তিক বিনাশ, ও জিজ্ঞাসু অন্তঃকরণের পূর্ণ পরিতৃপ্তি। তাই পাশ্চাত্যের দার্শনিক চিন্তার ইতিহাসে দেখা যায় যে, বৈজ্ঞানিক যখনই মানুষের অন্তঃকরণের এক দেশে শান্তি স্থাপন করিতে গিয়া অন্য এক দেশে অশান্তির সূচনা করিয়াছেন, দার্শনিক তখনই সকল বিরোধের চরম শান্তি কেমন করিয়া হইতে পারে, তাহা নির্ণয় করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু মানুষের অন্তরের দাবী অনন্ত, অসীম, সুতরাং তাহার পূর্ণ পরিতৃপ্তি অসম্ভব। সুতরাং কোন কোন দার্শনিক বলেন যে ঐ আদর্শকে যদিও আমরা বস্তুতঃ লাভ করিতে না পারি তবুও দার্শনিকের আক্ষেপের কারণ নাই, কারণ দার্শনিক চিন্তার মহত্ত্ব ঐ আদর্শের মহত্ত্ব ও গৌরবের জন্য, এবং তাহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে পারিলেই দার্শনিক জীবনের চরম সার্থকতা হইল। তাঁহারা সাধকের ভাষায় বলেন—

আমি মুক্তি চাই না হরি,
কেবল আসিব যাইব চরণ সেবিব এই
ভিক্ষা করি॥

পাশ্চাত্য মধ্যযুগের চিন্তাপদ্ধতি

পাশ্চাত্য সাধনার গরিমা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার বিপুল ঐশ্বর্য্যের প্রভায় আমাদের বর্ত্তমান দৈন্যের কলঙ্ক-রেখা যখন সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, তখন সাধারণতঃ আমরা অতীত সম্পদের আবরণে আমাদের বর্ত্তমান দীনতার লজ্জা নিবারণ করিবার চেষ্টা করি। কিন্তু যখন বুঝিতে পারি যে, কেবল মাত্র অতীত পূর্ণতার গৌরবে বর্ত্তমান রিক্ততাকে মণ্ডিত করিবার চেষ্টা আত্মপ্রতারণা ব্যতীত আর কিছুই নয়, তখন হয় ত বলি "ভারতের আধ্যাত্মিকতাই এই জাতীয় অধঃ-পতনের কারণ, আমাদের বর্ত্তমান. আমাদেরই যুগসঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-ভূমি।" আবার, যখন এইভাবে নিজের দারিদ্র্যকালিমা ও হীনতার কথা নিজের মুখে স্বীকার করিতে গিয়া আমাদের আত্মাভিমান ও দেশাভিমান সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, তখন "আধ্যাত্মিকতা ভারতবাসীর জাতীয় বৈশিষ্ট্য, উত্থানপতনশীল সভ্যতাসমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ভারতীয় সভ্যতা আধ্যাত্মিকতার অমৃত-কুণ্ডে স্নান করিয়া মৃত্যুবিজয়ী হইয়াছে, আর এই আধ্যাত্মিকতার মানদণ্ডে বিচার করিলে ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল দেশেরই আদর্শস্থানীয়" ইত্যাদি প্রচার করিয়া আমাদের সঙ্কীর্ণ মন্দিরে দেশাত্মবোধ ও

স্বদেশপ্রীতির উদ্বোধন করি। ভারতের আধ্যাত্মিকতার স্বরূপ কি, ভারত-সভ্যতার চিরন্তন রূপটি কি, আর ভারতবর্ষ যদি বাস্তবিকই অমরত্ব লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই অমৃতের মূল প্রস্রবণ কোথায়, এ সকলের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা বা দার্শনিকতা কোন একটি জাতির অমরত্ব কিংবা গৌরব-হীনতার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার সময় আমরা পরোক্ষভাবে জাতীয় উৎকর্ষ ও দর্শনশাস্ত্রের সম্বন্ধবিষয়ে যে ইঙ্গিত করি, তাহার অলীকতা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সাহিত্য, শিল্প, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরেই সভ্যতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, এই সত্যটিকে উপলব্ধি না করার ফলে দার্শনিকতায় সভ্যতার প্রাণস্পন্দন না দেখিয়া তাহাকে কোন একটি সভ্যতার বিশিষ্ট গুণমাত্র বলিয়া কল্পনা করা হয়। জাতির নিখিল শক্তি যতদিন পর্য্যন্ত কেবল ভৌতিক জীবনের উপকরণ সংগ্রহের জন্য ব্যয়িত হয়, জীবন সংগ্রামের জয়মাল্য যতদিন তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া থাকে, ততদিন জাতীয় উৎকর্ষ বা সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন হওয়া অসম্ভব। জাতীয় জীবনের এই নিম্নতম স্তরে, মানুষ জানে না, কোন্ পূর্ণ-মনুষ্যত্বের বীজ তাহার মধ্যে নিহিত আছে; সে যে কোন্ কল্পলোকের অধিবাসী, তাই তার আত্মবিকাশের উচ্ছ্বাস সকল সীমাকে অতিক্রম করিতে চায়, সে এখন তাহা উপলব্ধি করিবার

অবকাশ পায় না। শুধু জীবনকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিতেই সে ব্যস্ত, জীবন-সংরক্ষণ-প্রবৃত্তির প্রসাধনে সম্পূর্ণ-ভাবে আত্ম-বিক্রীত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন জীবন-সংগ্রামের তীব্রতা কমিয়া আসে, তখন এই সংঘর্ষের অব-সানে, বিজয় উল্লাসের মাঝে বিষাদ আসিয়া তাহার সুপ্ত সংস্কারকে জাগ্রত করে; তখন সে জানিতে পারে যে, জীবন সংরক্ষণ ও জীবনের সার্থকতা এক বস্তু নয়, তাই কেবলমাত্র জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিয়া তাহার অন্তর্নিহিত মহামানবটির তৃপ্তি হয় না। এখন সে চায় জীবনকে মনুষ্যত্বের গৌরবে মণ্ডিত করিতে, আপনার পূর্ণ প্রকাশের বীজকে অঙ্কুরিত করিতে। এই যে অন্তর্দ্দেবতার আহ্বানে চিত্তের ব্যাকুলতা, অন্তরাত্মার স্বরূপকে প্রকাশ না করার জন্য এই যে বিষাদ ও আত্মগ্লানি, ইহাই প্রকৃত সভ্যতার আদি উৎস; এবং ইহা হইতেই সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা-বিদ্যা প্রভৃতি অনন্তধারার উৎপত্তি। ভৌতিক জীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডীর সীমান্তে এই যে এক পরম রমণীয় বৃহত্তর জীবন—সাহিত্য, সঙ্গীত ও কলাবিহীন মনুষ্যকে বিষাণহীন পশুর সহিত তুলনা করিয়া বৈরাগ্য ও নিবৃত্তিপ্রধান ভারত-বর্ষও চিরকালই তাহার সম্মান করিয়া আসিয়াছে।

ঐ বৃহত্তর জীবনের কোমল স্পর্শে আমাদের হৃদয়ে যে সকল উন্নত সুকুমার বৃত্তিগুলির উন্মেষ হয়, তাহার মধ্যে

দার্শনিক চিন্তার যে প্রবৃত্তি সেইটিই এখানে আলোচ্য। মানুষকে একটু সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, তাহার জীবনটা এক বিরাট সমন্বয়-ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার সভ্যতা, সমাজ, ধর্ম্ম, জ্ঞান, রাষ্ট্র প্রভৃতি সকলের মূলেই একটি সামঞ্জস্যসূত্র বিদ্যমান। এই সামঞ্জস্যের যখন অভাব হয়, তখন সমাজ-দ্রোহ, ধর্ম্মনাশ, রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতির সূত্রপাত হয়। সকল পরিবর্ত্তনের মূলেই এই সমন্বয়াভাব বা বৈষম্য। জগতের অন্যান্য বস্তুর ন্যায় মানুষের মন-বস্তুটিও বিরোধের সংঘাতেই সচল হইয়া উঠে এবং ইহার ফলে জ্ঞানমন্দিরের সংস্কার আরম্ভ হয়। দৈনন্দিন জীবনের নিয়ামক জ্ঞান অন্তর্ব্বিরোধপূর্ণ বলিয়া সমন্বয়ধর্ম্মী বুদ্ধির উদ্বোধনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব সঞ্চিত বিশ্বাসগুলির মধ্যে যে আলোড়ন-সৃষ্টি হয়, সেইটিই বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের প্রথম হৃদয়স্পন্দন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এই বিশ্বাস-জগতের আলোড়ন ন্যূনাধিকভাবে অহরহঃ চলিতেছে। যাঁহাকে আমরা আদর্শচরিত্র বলিয়া জানি, যদি শুনি যে তিনি চুরির অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা হইলে এই অভিযোগের সংবাদে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার মধ্যে যে ভীষণ উদ্বেলন আরম্ভ হয়, সেটী সংস্কার বা পরিবর্ত্তনের সঙ্কেত মাত্র। বুদ্ধি যদি স্বভাবতঃই সমন্বয়-প্রবণ না হইত, অন্তর্ব্বিরোধের আবির্ভাবেও যদি তাহার মধ্যে কোন প্রকার

চঞ্চলতা না দেখা যাইত, তাহা হইলে সত্যানুসন্ধানের প্রবৃত্তি চিরকালই অজ্ঞাত ও অপরিচিত হইয়া থাকিত। এই জন্য একজন সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক (হেগেল) বলিয়াছেন যে, মানুষ স্বভাবতঃই দার্শনিক, কেবলমাত্র পশু-জগতেই দার্শনিকের জন্ম হয় না।

দার্শনিকতা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম্ম—এ কথাটি আমরা অনেক সময় স্বীকার করিতে পারি না। তৈল ও পাত্রের যে আধারআধেয় সম্বন্ধ লইয়া নৈয়ায়িক তুমুল তর্ক-কুজ্ঝ-টিকার সৃষ্টি করেন, তৈলবণিকের ক্ষুদ্র বিপণিতে প্রতি মুহূর্ত্তেই তো সে সমস্যার সমাধান হইয়া আসিতেছে; তেমনই দর্শন চিন্তার অঞ্জন লাগাইয়া বৈদান্তিক যে জগতে ঐন্দ্রজালিকের যাদুবিদ্যার চরম পরিণতি দেখিতে চাহেন; শয়ন, অশন প্রভৃতি জীবনের প্রত্যেক কার্য্যই তো সেই জগৎকে পরম সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। সুতরাং যে দার্শনিকতা সহজ বুদ্ধির উজ্জ্বল রশ্মিকে কৃত্রিম কুজ্ঝ-টিকায় আবৃত রাখিয়া অকারণে সমস্যা সৃষ্টি করে, এবং যে চিন্তার অনিবার্য্য সিদ্ধান্তকে জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তই অস্বাভাবিক ও মিথ্যা বলিয়া প্রচার করে, তাহার সহিত মানুষের স্বাভাবিক সম্বন্ধ কোথায়? যিনি কল্পনার উদ্দাম তুলিকায় সত্যজীবনের ব্যঙ্গচিত্র মাত্র অঙ্কিত করেন, তাঁহার দ্বারা জীবনের গৌরববৃদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়? এই

সকল প্রশ্ন আমরা ততক্ষণই জিজ্ঞাসা করি, যতক্ষণ মানুষকে মনুষ্যত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখার ভুল আমাদের নয়নগোচর হয়না। আমাদের অভিজ্ঞতার উৎপত্তি হয় খণ্ডভাবে, কিন্তু তাহার পরিণতি হয় অখণ্ডতায়। অঙ্গুলি অবলেহনে যে তৃপ্তি. ক্ষুদ্র শিশু সেইটিকেই অঙ্গুলির চরম সার্থকতা বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাহার অভিজ্ঞতার পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝিতে পারে, মনুষ্যজীবনের কতখানি জুড়িয়া অঙ্গুলির কর্ত্তব্যক্ষেত্র, আর চিত্রকর, ভাস্কর, লেখক, উপাসক প্রভৃতির নিকট কত শত ভাবে অঙ্গুলির সার্থকতা হইয়া থাকে। আবার যাহাকে সে শিশুকালে কেবলমাত্র একটি অবলেহ্য বস্তু বলিয়া জানিত, এখন তাহাকে দেহের সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে সম্বদ্ধ দেখিতে পায়। অঙ্গুলি একটি বৃহত্তর বস্তুর অংশ মাত্র, দেহের সহিত শিরায় শিরায় রক্তে রক্তে তাহার নিগূঢ় সম্বন্ধ বিদ্যমান, অঙ্গুলির অতীত জীবনের কাহিনীর সঙ্গে মাতা পিতা প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষদিগের জীবন ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট—এই সকল তথ্যের সহিত শিশুজীবনের অপরিণত বুদ্ধির তুলনা করিয়া সে জানিতে পারে, তাহার শৈশবঅভিজ্ঞতা কত অসম্পূর্ণ ও কত সঙ্কীর্ণ। তেমনই মানুষকে যতক্ষণ আমরা তাহার অতীত, ভবিষ্যৎ, সমাজ, নীতি প্রভৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি, ততক্ষণ মানুষের অখণ্ড রূপটি আমাদের অজ্ঞাত

থাকে ; এই জন্যই আমরা সাধাণতঃ হয় দেহাত্মবাদী কিম্বা ইন্দ্রিয়াত্মবাদী। আর এই অসম্পূর্ণ খণ্ডজ্ঞানের মানদণ্ডে. কেবলমাত্র দার্শনিকতা নয়, পরন্তু সাহিত্য, সুকুমার শিল্প, বিশুদ্ধ জ্ঞানানুশীলন প্রভৃতি সকল কাজই নিরর্থক বলিয়া মনে হয়।

আবার দার্শনিকের সিদ্ধান্তে সত্যজীবনের ব্যঙ্গচিত্র আমরা ততক্ষণই দেখি, যতক্ষণ সহজবুদ্ধির অসম্পূর্ণতা ও অন্তর্ব্বিরোধ আমাদের অগোচর থাকে। দার্শনিক চিন্তা-প্রভাবে সহজ বুদ্ধির রূপ-বিকৃতি ঘটে, এ কথাটি যেমনই সত্য, দার্শনিক সত্যজীবনের ব্যঙ্গচিত্র অঙ্কিত করেন, এ কথাটি তেমনই মিথ্যা। আমরা যাহাকে স্বাভাবিক জ্ঞান বা কার্য্যকরী জ্ঞান বলি, তাহাতে যদি সত্যের চিত্র প্রতি-ফলিত হইত, তাহা হইলে দর্শনশাস্ত্রকে উন্মত্ত কল্পনার আকস্মিক সৃষ্টি ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইত না। কিন্তু আমাদের অমার্জ্জিত চিত্ত-দর্পণে বিশ্ব-স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয় না এবং সহজবুদ্ধির সুবোধ্য ইঙ্গিত সত্যপথে লইয়া যায় না বলিয়াই, বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের সৃষ্টি হয়। মর্ম্মর প্রস্তর যদি স্বভাবের প্ররোচনায় মূর্ত্তিতে পরিণত হইতে পারিত, তাহা হইলে ভাস্কর্য্য যেমন নিরর্থক হইত, সহজ-বুদ্ধির ফলকে বিশ্বস্বরূপ প্রকটিত হইলে দর্শনচিন্তাও তেম-নই উদ্দেশ্যহীন হইয়া পড়িত। কিন্তু প্রস্তরের অন্তর্নিহিত

জীবন্তমূর্ত্তি ভাস্করের শিল্পপ্রতিভা ব্যতীত আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, প্রস্তরখণ্ড তাহার স্বাভাবিক রূপের আবরণে যাহাকে অপ্রকাশিত রাখে, ভাস্কর তাঁহার শিল্পপ্রতিভার মোহন মন্ত্রে সেইটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। আর ইহার ফলে প্রস্তরের স্বভাবজাত রূপের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। সেইপ্রকার আমাদের সহজজ্ঞান বা স্বাভাবিক বুদ্ধির মিথ্যা আবরণ ও স্বভাবজাত ত্রুটি নিরাকরণ করিয়া সত্যের স্বরূপকে প্রকটিত করিবার প্রয়োজন হয় বলিয়াই দর্শন-প্রতিভার প্রভাবে সহজবুদ্ধির আকার বিকৃত হয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক টলেমি সহজবুদ্ধিকে ভিত্তি করিয়া, সৌরজগতের যে বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিকপ্রবর কোপার্নিকসের কঠোর স্পর্শে তাহা ভূমিসাৎ হওয়া সত্ত্বেও আমরা কোপার্নিকসের নবরচিত মন্দিরেই সত্যদেবকে অঞ্জলি প্রদান করি। কবির কল্পনায় এখনও দিনমণি পূর্ব্বগগনে উদিত হইয়া মুদিতা কমলিনীর নিদ্রাভঙ্গ করে, কিন্তু জ্ঞানী দেখেন যে, কমলিনীই অভিসারিকা রমণীর ন্যায় প্রতি নিশিতেই প্রিয়সন্দর্শনে যাত্রা করিয়া থাকে। সহজবুদ্ধির আলোকে দেখিলে সূর্য্যই গতিশীল, কিন্তু সত্যজ্ঞানের মানদণ্ডে সূর্য্যদেব অবিচলিত ভাবে অভিসারিকা কমলিনীর প্রতীক্ষা করেন মাত্র। তেমনই আবার মানুষের ঊর্দ্ধপাদ ও অধঃশির হইয়া ভ্রমণ করা সহজবুদ্ধির নিকট অপ্রাকৃতিক বোধ হয় বটে কিন্তু বৈজ্ঞানিক যখন বুঝাইয়া দেন যে, ঊর্দ্ধ ও অধঃ সম্বন্ধীয় জ্ঞান আপেক্ষিক মাত্র, তাই লক্ষ

লক্ষ নরনারী অনাদিকাল হইতে এইভাবেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, তখন সহজ-বুদ্ধির সুবোধ্য ইঙ্গিত অগ্রাহ্য করিয়া এই কষ্টকল্পিত চিত্রকেই সত্য বলিয়া আমরা বরণ করি। মানুষের স্বাভাবিক জ্ঞান যে কত অসম্পূর্ণ, ইহাতে সত্যের যথার্থ রূপটি যে কত বিকৃত অবস্থায় থাকে, এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে যখন তাহা আমরা বুঝিতে পারি, আর তখন বৈজ্ঞানিক কিম্বা দার্শনিকের বিশ্বচিত্রকে ব্যঙ্গচিত্র বলিয়া উপহাস করিতে পারি না। আপাতদৃষ্টিতে যাহা অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক, তাহাও যে সত্য হইতে পারে, ইহা বিস্মৃত হওয়ার ফলেই আমরা অনেকেই বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিকের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি না; এটা আমাদের চিন্তাশীলতা ও সত্যপ্রেমিকতার অভাব ব্যতীত আর কিছুই নয়। সাধারণতঃ দৈনন্দিন জীবনের সঙ্কীর্ণ আয়তনের মধ্যে চিন্তাশক্তি আবদ্ধ থাকে বলিয়া আদর্শসত্যের অনুপ্রেরণা উপলব্ধ হয় না; কিন্তু যে দ্বন্দ্বাতীত পূর্ণসমন্বয় জ্ঞানান্বেষীর চির-ঈপ্সিত বস্তু তাহার প্রতি মনুষ্য-চিত্তের আকর্ষণ এত স্বাভাবিক যে দার্শনিকতা মানুষের একটি ধর্ম্ম বলিলে কোনও অত্যুক্তি হয় না। অন্তর্ব্বিরোধপূর্ণ স্তূপীকৃত বিশ্বাসগুলি বুকের মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া আমরা সুখে শান্তিতে জীবন কাটাইয়া দিই; এ যেন সুতীক্ষ্ণ কণ্টকশয্যায় শায়িত নিশ্চল শবদেহের পূর্ণ ঔদাসীন্য। চিন্তাশীলের পক্ষে এই ঔদাসীন্য সম্ভবপর হয় না বলিয়া তাঁহার মন বিরোধের স্পর্শে বিদ্রোহী

হইয়া উঠে; এবং ইহার ফলে সত্যের আহ্বানে অদ্ভুত তথ্যকে ও তিনি বরণ করিতে বাধ্য হন। সেই জন্য গ্রীক ও রোমের চরমোৎকর্ষের যুগে কেবলমাত্র দার্শনিককেই সত্যপ্রেমিক আখ্যা দেওয়া হইত।

পাশ্চাত্য চিন্তার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, সেখানে এমন একটা যুগ ছিল, যখন শাস্ত্রশৃঙ্খলের নিবিড় নিষ্পেষণে মানুষের অন্তরাত্মা একবারে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিল। বাইবেল পরমদয়ালু পরমেশ্বরের বিশুদ্ধ করুণাসম্ভূত। অতএব ইহা যে কেবল ধর্ম্মপথবিচ্যুত পাপসন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করে তাহা নহে; পরন্তু, মানুষের সর্ব্ববিধ জ্ঞাতব্য তথ্যের শাস্ত্রই একমাত্র পূর্ণ ভাণ্ডার এবং তাহার স্বচিন্তাপ্রসূত সকল সিদ্ধান্তের একমাত্র অগ্নিপরীক্ষার স্থল। মানুষ স্বভাবতঃ বিকৃতবুদ্ধি; তাহার বুদ্ধি যে রশ্মি বিকিরণ করে, তাহার আলোক সত্যের পথ তমসাবৃত করিয়া অসত্যের পথকেই উদ্ভাসিত করে। সুতরাং কেবল তর্ক ও চিন্তার প্রভাবে আমরা যে সিদ্ধাতে উপনীত হইয়া থাকি, শাস্ত্রবহ্নির পূতস্পর্শে তাহার বিশুদ্ধতার পরীক্ষা না হইলে তাহা সত্য হইতে পারে না। এই ভাবে খ্রীষ্টান-যাজকগণ যখন চিন্তাশক্তির ত্রুটি প্রমাণ করিতে গিয়া চিন্তাশক্তিরই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলেন এবং মানুষের চতুর্দ্দিকে লৌহ-প্রাচীর গঠন করিয়া তাহার আত্মনির্ভরতা ও আত্মপ্রত্যয়ের অঙ্কুর বিনষ্ট করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া উঠিয়াছিলেন;

তখন তাহার প্রাকারবেষ্টিত মনটি অনন্ত আকাশের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের দিকেই চাহিয়া মুক্তির প্রতীক্ষায় বসিয়াছিল। কালক্রমে লৌহপ্রাকারের শক্তি হ্রাস হইতে লাগিল। শক্তি যতক্ষণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, ততক্ষণই তাহার প্রভাব অপ্রতিহত থাকে। তাই যে মুহূর্ত্ত হইতে ধর্ম্মযবনিকার অন্তরালে অন্তঃসমাহিত মানুষের প্রাণহত্যা চলিতে লাগিল, শাস্ত্রবচন যখন স্বার্থসিদ্ধির সহজ সোপান হইয়া দাঁড়াইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই মিথ্যার কুলিশস্পর্শে যাজকের সুরক্ষিত প্রাসাদ কম্পিত হইতে লাগিল। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য দেশের শৃঙ্খলবদ্ধ মানুষটি নূতন প্রাণের সাড়াতে জাগিয়া দেখিল যে পশ্চিমের বিস্তৃত প্রান্তরে এক বিরাট শূন্য মন্দির প্রাণহীন শবদেহের মত দিগন্ত জুড়িয়া পড়িয়া আছে। তখন সে নবজীবনের অমিত শক্তির প্রভাবে লৌহপ্রাচীর চূর্ণ করিয়া যখন বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার শঙ্খধ্বনির প্রাণস্পর্শী আহ্বানে চারিদিকে নবজাগরণের আনন্দসাড়া পড়িয়া গেল। জ্ঞানমন্দির ধর্ম্মমন্দির প্রভৃতি সর্ব্বত্রই নূতন ভিত্তি স্থাপনের জন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব; তাহাদের সকলের মুখেই এক বাণী—"সংস্কার"।

পশ্চিমের এই উদ্বোধনের দিনে যে সকল শক্তি পুঞ্জীভূত হইয়া মানুষকে শাস্ত্রবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিল, তাহার মধ্যে ধর্ম্মক্ষেত্রে লুথার এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপার্নিকস প্রমুখ বৈজ্ঞানিকের সংস্কারনীতি সুপ্রসিদ্ধ। "ধর্ম্মাধ্যক্ষ ভগবানের একমাত্র পার্থিব প্রতিনিধি, সুতরাং তিনি যদি পাপীর কলুষ-

ক্ষালনের জন্য অর্থ গ্রহণ করেন, এবং ইহার বিনিময়ে স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করিতে স্বীকৃত হন, তাহা হইলে ইহাকে করুণানিধান পরমেশ্বরের আদেশবাণী ভাবিয়া ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি মাত্রেরই অর্থ বিনিময়ে মুক্তি ক্রয় করা পরম কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষের অনুচরবর্গ যখন ধর্ম্মের অন্তরালে অধর্ম্ম ও স্বার্থসিদ্ধির পথ আবিষ্কার করিতে লাগিলেন, তখন মানুষের ধর্ম্মময় অন্তরাত্মা ভিতর হইতে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, আর এই ভীষণ শব্দে লুথার, জুইংগ্লি, ক্যালভিন্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নিদ্রাঘোর ছাড়িয়া গেল। তাঁহারা বিদ্রোহপতাকা হাতে লইয়া অন্তঃসারশূন্য ক্যাথলিক চার্চ্চের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন, এবং মানুষের নিশ্চলপ্রায় বিবেকবুদ্ধিকে অধর্ম্মের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এদিকে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিষ্টট্‌লের চিন্তাসম্পদ্ বহুদিন ধরিয়া খ্রীষ্টানজগতে সুপরিচিত হইয়া আসিতেছিল। ইহার ফলে সকলের মনেই একটা স্বাধীন চিন্তার মুক্তধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। ক্রমে যখন কলম্বস্, ভাস্কো-ডি-গামা, মেগালান,কোপার্নিকস কেপ্‌লার প্রভৃতি কৌতূহলী পণ্ডিতগণ পৃথিবী ও সৌরজগতের নূতন নূতন কাহিনী প্রচার করিতে লাগিলেন, তখন সকলের মনেই বাইবেল-উক্ত তথ্য সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইল; বাইবেল যে নিখিল তথ্যের নিকষ পাথর নয়, এই বিশ্বাসই উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ধর্ম্মরক্ষকগণ এই অধার্ম্মিক জড়বাদী-দিগের সাহস ও ধৃষ্টতা দেখিয়া যুগপৎ ক্রুদ্ধ ও ভীত হইয়া পড়িলেন।

প্রধানতঃ, সৌরজগতের অভিনব কাহিনীটিই শাস্ত্রোক্ত বাণীর মর্য্যাদাহানি করিল। বৈজ্ঞানিক বলিলেন "অপরিসীম মহাশূন্যের মধ্যে অনন্ত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী প্রকৃতির নিয়মে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে সূর্য্যকে কেন্দ্র করিয়া পরিক্রমণ করিতেছে, এই পরিক্রমণকারী গ্রহসমূহের মধ্যে পৃথিবীও একটি গ্রহমাত্র।" বাইবেলের পাতা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখা হইল, কিন্তু এই সৌরজগতের কোন সঙ্কেতই পাওয়া গেল না। অধিকন্তু, ইহার নূতন চিত্র শাস্ত্রোক্ত বাক্যের সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়াই বোধ হইল। বিশ্ব যদি অসীম হয়, তাহা হইলে বিশ্বস্রষ্টার স্বর্ণসিংহাসন কোথায় ? বিশ্বস্রষ্টা তবে কি বিশ্বেরই অন্তর্গত ? স্বর্গ, মর্ত্ত প্রভৃতি শাস্ত্রীয় বিভাগ কি তবে মিথ্যা ? অসম্ভব। এই ভাবিয়া মঠাধ্যক্ষগণ জড়বাদীর অশাস্ত্রীয় দানবী চিন্তার উচ্ছ্বাসকে গির্জ্জার চতুঃসীমামধ্যে আবদ্ধ করিয়া স্বাধীন গবেষণার ভীষণ উৎসটিকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিলেন। কোপানিকসকে শাস্তি গ্রহণ করিতে হইল, গ্যালিলিও সত্যবাণী প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের ভৌতিক দেহের অন্তরালে যে মন বস্তুটি ছিল, যাজকগণ তাহা বিস্মৃত হইলেন। বৈজ্ঞানিকগণ নির্য্যাতিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা যে চিন্ময়-প্রস্রবণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার শক্তির সঙ্গে সত্যের যোগ ছিল বলিয়া আর তাহাকে গির্জ্জার মধ্যে বদ্ধ রাখা গেলনা। কেবল মাত্র সত্যের বলে, গির্জ্জার পাষাণপঞ্জর বিদীর্ণ করিয়া ও সংরক্ষণশীল ধর্ম্মাধ্যক্ষের সহস্র বিঘ্ন উপেক্ষা করিয়া মুক্তস্রোত ছুটিয়া চলিল। নূতন নূতন আবিষ্কার-

যন্ত্র ও অভিনব অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্যের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বিজ্ঞানের পুষ্টিসাধন করিতে লাগিল। এইভাবে পশ্চিম-দিকের আভ্যন্তরীণ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া ইউরোপের চিন্তাজগতে তরুণ চিন্তার কিরণস্পর্শে যে নূতন প্রভাতের সূচনা হইল, তাহাকে বর্ত্তমান যুগ আখ্যা দেওয়া হয়।

মানুষের জীবনপ্রবাহের একটি মুখ প্রলয়ের দিকে, আর একটি সৃজনের দিকে। এক দিকের রুদ্র গর্জ্জনে সৃষ্ট সংসার চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়ে, আর অন্যদিকের শঙ্খধ্বনিতে প্রলয়ের মাঝেও নূতন সৃষ্টির মঙ্গল-ঘট স্থাপিত হয়। আর এই সৃষ্টি ও সংহারের অন্তরালে যে মূল শক্তি আছে, সেটি পূর্ণমনুষ্যত্বের আত্মস্ফুরণের আবেগ; ইহা হইতেই সামাজিক বন্ধন, ধর্ম্মশাস্ত্র, নৈতিক জীবন প্রভৃতির উৎপত্তি। বংশীবাদক যেমন কণ্ঠনালীনিঃসৃত বায়ুর গতিকে বংশীরন্ধ্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া বায়ুর আনন্দরূপটিকে প্রকটিত করে, মানুষও তেমনই তাহার অন্তর্নিহিত বিকাশের উচ্ছ্বাসকে সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতির বিচিত্র বন্ধন দ্বারা সংযত করিয়া আপনাকে পূর্ণানন্দের দিকে লইয়া যায়। পূর্ণ-অভিব্যক্তির রন্ধ্ররূপেই বন্ধনের সার্থকতা। সেই জন্য সমাজ, ধর্ম্ম বা রাষ্ট্রশক্তি যখন মানুষের আত্মস্ফুরণের স্রোত নিয়ন্ত্রিত না করিয়া সম্পূর্ণভাবে তাহার গতিরোধ করে, তখন জগতে প্রলয়ের প্লাবন আরম্ভ হয়। আবার নূতনসৃষ্টির প্রসববেদনারূপেই প্রলয়ের সার্থকতা। সেই জন্য সংহারহুঙ্কারের হট্টরোলে মঙ্গলঘট ভাঙ্গিয়া পড়িলে প্রলয়ের

অরুন্তুদ যন্ত্রণা নিরর্থক হইয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের আকাশ জুড়িয়া এই প্রকার একটি প্রলয়হুঙ্কার শুনিতে পাওয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে মানুষের মনকে শাস্ত্র-বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার জন্য যে বিপুল আয়োজন হইয়াছিল, তাহার ফলে মন এখন আর কোন বন্ধনই স্বীকার করিতে চাহিল না। পিঞ্জরমুক্ত বিহঙ্গম যেন আকাশের বায়ু-স্তরকেও তাহার স্বাধীনগতির একমাত্র প্রতিবন্ধক ভাবিয়া একেবারে বায়ুশূন্য বিমানে বিচরণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। "আরও আলো" "আরও স্বাধীনতা," এই শব্দের প্রতিধ্বনিতে ইউরোপের আকাশ বাতাস ভরপুর হইয়া উঠিল। "সমাজ মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতার কৃত্রিম বন্ধন; ধর্ম্মশাস্ত্রের লিপিবদ্ধ নিয়মাবলী অন্তর্নিহিত ধর্ম্মবুদ্ধির অস্বাভাবিক অন্তরায়; অবাঙ্‌মনসগোচর সত্তা অলীক কল্পনার কৃত্রিম সৃষ্টি; অতএব বাহ্যিক বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেল, মনকে অচিন্তনীয় জগতের কুজ্ঝটিকা হইতে স্পষ্ট আলোকের দিকে লইয়া চল।" এইভাবে সমাজ, ধর্ম্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই আত্মপ্রত্যয় ক্রমে আত্মম্ভরিতায় পরিণত হইল, স্বাধীনতা ক্রমে উচ্ছৃঙ্খলতায় পর্য্যবসিত হইতে চলিল। বংশীবাদক যেন বংশীরন্ধ্রের সঙ্কীর্ণতায় বিরক্ত হইয়া তাহার বক্ষবদ্ধ প্রাণবায়ুকে পঞ্জরমুক্ত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভে নবজীবনের শক্তিতে নির্ভর করিয়া যে বিজ্ঞান নানাবিধ অভিনব সত্য আবিষ্কার করিয়াছিল,

তাহার সহিত এই অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাস্রোতের একটা অন্তরের মিল ছিল। পাশ্চাত্য দেশে যাহাকে বিজ্ঞান বলা হয়, তাহার মূল ভিত্তি ইন্দ্রিয়; রূপ-রস-গন্ধময় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎকে বৈজ্ঞানিকগণ একটি স্বাধীন সত্তা বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইয়া থাকেন। জগতের কার্য্যকারণসূত্র নিরূপণ করিতে গিয়া কতকগুলি অতি সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য বস্তুর সত্তা তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হন বটে, কিন্তু সেগুলিও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর অনুকরণেই কল্পিত হইয়া থাকে, এবং তাহাদের প্রমাণের জন্য ইন্দ্রিয়ভাস্য জগৎকেই আশ্রয় করিতে হয়। সেই জন্য পর্য্যবেক্ষণ ও ভূয়োদর্শন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের একমাত্র অধিষ্ঠানভূমি। বৈজ্ঞানিক এমন কোন বস্তু স্বীকার করিতে পারেন না যাহা ইন্দ্রিয় কিম্বা ইন্দ্রিয়ানুসক্ত ও ইন্দ্রিয়প্রতিষ্ঠিত কল্পনার সম্পূর্ণ অগোচর। অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাস্রোতের উপরেও এই ইন্দ্রিয়ানুসক্ত বুদ্ধির প্রতিবিম্ব স্পষ্টভাবে দেখা যায়। দার্শনিকগণের মধ্যে অনেকেই ইন্দ্রিয়লব্ধ সত্যকে নিখিল জ্ঞানের কষ্টিপাথর ভাবিয়া অতীন্দ্রিয় সত্তাকে কল্পনাশক্তির অলীক সৃষ্টি বলিয়া পরিহার করিলেন। কেহ কেহ আবার ইন্দ্রিয়াতীত জগৎকে অস্বীকার করিতে না পারিয়া বিচারশক্তিকে ইন্দ্রিয়ের উপরে স্থান দিলেন এবং কেবলমাত্র তর্ক ও বিচারের ক্ষিপ্রযানে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রিয়পরিধির সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিলেন। এই উভয়বিধ চিন্তাস্রোতের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ থাকিলেও

তাহারা মিলিয়াছিল একটি স্থানে। প্রতিকূল স্রোতদ্বয়ের সঙ্গমস্থানটিকে এক কথায় অভিহিত করিতে হইলে বলিতে হয় যে, এটি অহমিকা ভূমি। মানুষের মনের অগোচর কিছুই থাকিতে পারে না, তাহার চিন্তাশক্তির অব্যাহত গতির সম্মুখে সীমান্তের প্রাকারসমূহ চূর্ণ হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। এই অহমিকা বা আত্মম্ভরিতা যখন ধর্ম্মপ্রাণ ভগবদ্ভক্তের অন্তরে আসিয়া আঘাত করিল, তখন তাঁহারা অন্ধবিশ্বাস কিম্বা অন্তর্ব্বাণীর আশ্রয় লইয়া ভক্তির উৎসকে সঞ্জীবিত রাখিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অন্ধ বিশ্বাসের যুগ তখন কাটিয়া গিয়াছিল, অনুশীলন ও আলোচনাশক্তির যতই উন্মেষ ও পরিণতি হইতে লাগিল, মানুষের অন্ধবিশ্বাসের উপর আস্থাও ততই হ্রাস হইতে আরম্ভ হইল। সুতরাং যাঁহাদের মধ্যে জ্ঞানপিপাসা ও ভগবদ্ভক্তি উভয়ই প্রবল, তাঁহারা বজ্রাহত ভগ্ন প্রাচীরের ন্যায় অন্তরে দ্বিখণ্ডিত হইয়াও নানাপ্রকার মিথ্যা-আবরণে আন্তরিক দুর্ব্বলতা গোপন করিতে চেষ্টা করিলেন।

ইউরোপের চিন্তারাজ্যে যখন এই প্রকারে বুদ্ধি ও ভক্তির কলহ বিকট আকার ধারণ করিয়াছিল, যখন দার্শনিকের সহিত দার্শনিকের এবং বিজ্ঞানের সহিত দর্শনশাস্ত্রের সংঘাতের ফলে সত্যের পথ ধূসরাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় দার্শনিকপ্রবর ইম্যানুয়েল কান্টের চিন্তানির্ঝরিণীর সৃষ্টি হয়। তিনি দেখিলেন

যে, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ভক্ত প্রভৃতি সকলেই নিজেদের প্রকৃত সীমা অতিক্রম করিতে গিয়াই এই নিষ্ফল কলহের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর এই সকল কলহের মূলে আছে আর একটি নিগূঢ়তম কারণ,—সেটি মানুষের আত্ম-বিস্মৃতি।

মহামনীষী কাণ্ট্

কতকগুলি প্রশ্ন আছে, তাহারা দেশকালনির্ব্বিশেষে চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তরে আসিয়া আঘাত করে; আর কতকগুলি প্রশ্ন আছে সেগুলি কেবল অন্তর খুঁজিলে পাওয়া যায় না; কারণ, অন্তরের সহিত আবেষ্টনের সংঘাতেই তাহাদের উৎপত্তি। মানুষের চিন্তাপদ্ধতি ও জ্ঞানপ্রণালী সম্বন্ধে কাণ্ট্ যে প্রশ্নগুলির অবতারণা করিলেন, তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে হইলে কাণ্টের চিন্ময়-আবেষ্টনটি জানা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য জগৎ "ঋতং বিদ্ধি" এই মন্ত্রের মোহিনী শক্তি যখন প্রথম অনুভব করিয়াছিল, তখন অনিত্য পরিবর্ত্তনশীল বহু সত্তার মধ্যে শাশ্বত এক বস্তুটি কি, এইপ্রশ্নটিই তাহার অন্তরের দ্বারে আসিয়া আঘাত করে। এই আদি প্রশ্নটির সমাধান করিতে গিয়া জানা গেল যে, যে মন্দির হইতে ঐ মন্ত্রধ্বনি উঠিতেছে, তাহার পথ এমনই দুর্গম যে কঠোর পরিশ্রম ও একনিষ্ঠ সাধনাকে জীবনসহচর বলিয়া বরণ করিতে না পারিলে সে পথ খুঁজিয়া পাওয়ার উপায় নাই। তথাপি পাশ্চাত্য জগৎ মন্ত্রাবিষ্টের মত ঐ পথেই অগ্রসর হইতে লাগিল। নিজের প্রবৃত্তি ও অধিকার অনুযায়ী নানাবিধ সাধক-নানাবিধ সাধনমার্গ অবলম্বন করিলেন; এবং ইহার ফলে দার্শনিকের ও বৈজ্ঞানিকের

সাধনমার্গ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু পথ পৃথক হইলেও গন্তব্য স্থান এক, সুতরাং বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া যখন তাঁহারা বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সমাহিতচিত্তে পথপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হওয়া দরকার হইল; এবং তাহার ফলে, বিজ্ঞানসম্মত পথটির প্রকৃতপরিচয় পাইবার সুযোগ ঘটিল। কাষ্ঠমুদ্গারের কঠিন আঘাতকে স্বেচ্ছায় আলিঙ্গন করিয়া যে ভাবে ভৌতিক দেহ আপনার পুষ্টিসাধন করে, সেই ভাবে দর্শন-শাস্ত্র ও বিজ্ঞান পরস্পরকে আহত করিয়া পরস্পরের উন্নতিসাধনের প্রকৃত সহায় হইয়া উঠিল। বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের ঘাতপ্রতিঘাতই পাশ্চাত্যগবেষণার বৈচিত্র্য, আর এইটিই তাহার অমিত শক্তির মূলাধার। কাণ্টের প্রশ্নগুলিও এই ঘাতপ্রতিঘাতের ফল।

বহুদিন হইতেই নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধির করণ ও কারণ লইয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল। গ্রীক-দর্শনের যুগে অনেকেই ছিলেন যুক্তিমার্গের সাধক। তাঁহারা বলিতেন যে, যে ইন্দ্রিয় অলাতচক্র, মরীচিকা প্রভৃতি ভ্রান্ত বুদ্ধির জন্মনিকেতন, যে ইন্দ্রিয় অবস্তুকে বস্তুর আভাস দেয় ও অভাবের উপর ভাবের আরোপ করে, যে ইন্দ্রিয়সমূহের উৎকট বিরোধের মধ্যে একনিষ্ঠ সত্যের ললিত ধ্বনি লুপ্ত হইয়া যায় সেই ইন্দ্রিয়ের আপাতমধুর আহ্বানে আকৃষ্ট হইলে সত্যপ্রেমিকের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবারই সম্ভাবনা। গ্রীকসভ্যতার যুগে বিজ্ঞানের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ছিল না, সুতরাং ইন্দ্রিয় ও যুক্তিশক্তির বিরোধটি ঘনীভূত হইতে পারে নাই।

কিন্তু ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞান যতই পুষ্টিলাভ করিতে লাগিল, "প্রবৃত্তির সফলতা" প্রদর্শন করিয়া বিজ্ঞান যতই নিবিড় ভাবে ইন্দ্রিয়ের দাবী সমর্থন করিতে লাগিল, ততই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বিচারপদ্ধতি একেবারে উপেক্ষা করিয়া সাধকের আসন গ্রহণ করিবার অধিকারও হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

বর্ত্তমান যুগের সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া যে দুইটি সাধনার মূর্ত্তি অঙ্গুলিসঙ্কেতে পাশ্চাত্য চিন্তার দিক্ নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহারা যথাক্রমে ইন্দ্রিয়বাণী ও বিচারশক্তিকে নিখিল প্রমাণ-প্রবাহের বিশ্রামস্থল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। ইংরাজ দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন ছিলেন ইন্দ্রিয়বাণী ও ভূয়োদর্শনের পক্ষপাতী। তিনি বলিলেন "দার্শনিক যদি ইন্দ্রিয়ের সুস্পষ্ট সঙ্কেত উপেক্ষা করিয়া, ভূয়োদর্শন ও সম্যক পর্য্যালোচনার কষ্টস্বীকার না করিয়া, কেবলমাত্র ঊর্ণনাভের ন্যায় ভিতর হইতে জাল সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তাঁহার গবেষণায় কখনই সত্যের পথ উদ্ভাসিত হইবে না। ইন্দ্রিয়ভিত্তি বিনষ্ট করিলে দার্শনিক চিন্তা ও উদ্দাম কল্পনার মধ্যে কোনই পার্থক্য থাকিতে পারে না।" অন্যদিকে ফরাসী পণ্ডিত ডেকার্ট ছিলেন গণিতশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। তিনি বলিলেন "যে প্রমাণপ্রণালী অবলম্বন করিয়া অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভ্রান্ত সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন, দর্শন-শাস্ত্রেও সেই প্রণালীই একান্ত অনুকরণীয়। যেমন কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ সূত্র জ্যামিতিশাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া থাকে,

দর্শনশাস্ত্রেও তেমনই কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে পথপ্রদর্শক না ভাবিয়া কোন একটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যকে ভিত্তি করিতে পারিলে দার্শনিক নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধির অধিকারী হইতে পারিবেন।" এই যে ইন্দ্রিয়বাদ ও বিচারবাদের মধ্যে পার্থক্য, সেটি কিছুদিন পরে জার্ম্মান দার্শনিক লাইবনিজ ও ইংরাজ দার্শনিক লক্এর বাদপ্রতিবাদের ফলে অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। লাইবনিজ-প্রবর্ত্তিত বিচার-বাদের চিন্ময় স্রোত জার্ম্মানীপ্রদেশের যে স্থানটি দিয়া অবারিত ভাবে প্রবাহিত হইতেছিল, তাহারই সন্নিকটে কাণ্টের শিক্ষাদীক্ষা আরম্ভ হয়। সেই জন্য তাঁহার প্রথম জীবনের গবেষণায় কেবল মাত্র বিচার-বাদেরই প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কোনও এক শুভ মুহূর্ত্তে তিনি যেন সংস্কারের দুশ্ছেদ্য আবরণের মধ্য দিয়া সত্যের উপাধিমুক্ত বিশ্বরূপটি দেখিতে পাইলেন। যেদিন তিনি স্কট্ল্যাণ্ডের দার্শনিক ডেভিড্ হিউম এর সূক্ষ্ম বিচারপূর্ণ দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, সেই দিনটি তাঁহার জীবনের একটী শুভ মুহূর্ত্ত। এই কথাটি তিনি সরলচিত্তে স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

বেকনের ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়া লক্ যে ইন্দ্রিয়বাদ ও ভুয়োদর্শন-বাদের ভিত্তি স্থাপন করেন, সেইটিই হিউমের দার্শনিক চিন্তার আশ্রয়ভূমি। লক্ যে অনুভবগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করিয়া তাহাদের উপর গবেষণার বিরাট্ মন্দির

গঠন করিয়াছিলেন, সেগুলি ঐ মন্দিরের গুরুভার বহন করিতে সমর্থ কি না, তাহা চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। মানুষ যখন জন্মগ্রহণ করে, তাহার চিত্ত মসীচিহ্নশূন্য কাগজের ন্যায় একেবারে সংস্কারহীন অবস্থায় থাকে, ক্রমে ক্রমে অন্ত-রিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়প্রণালী দ্বারা জ্ঞান সঞ্চয় হইলে ঐ নিষ্কলঙ্ক পত্র তথ্যপূর্ণ হইয়া উঠে, এই কথাটি লক্ চরম-সত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন। অন্তরিন্দ্রিয় ও বাহ্যেন্দ্রিয় আমাদের জ্ঞান-কুটীরের দুইটি গবাক্ষ স্বরূপ। সকল প্রকার জ্ঞানের আদি উপাদানগুলি এই দুইটি গবাক্ষ ব্যতীত চিত্তে প্রবেশ করিতে পারে না। শ্রোত্র, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা কতকগুলি আলোচনজ্ঞান মাত্র হয় এবং এই সমস্ত করণার্পিত বিষয়গুলিই প্রথমতঃ চিত্তের আলোচ্য বস্তু হইয়া থাকে। কিন্তু কালক্রমে পূর্ব্বগৃহীত করণার্পিত ও অমিশ্রিত শব্দ, রূপ, রস প্রভৃতি কর্ম্মশীল চিত্তের দ্বারা সংযুক্ত হইলে জাতিধর্ম্মাদিবিশিষ্ঠ মিশ্রিত প্রত্যক্ষজ্ঞানের উদয় হয়। এতদ্ব্যতীত লক্ আর একটি তথ্য প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলিয়াই গ্রহণ করিলেন, সেটি ডেকার্টপ্রমুখ ফরাসী-দার্শনিকগণ অভ্রান্ত সত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছিলেন। ঘটপটাদি বাহ্য পদার্থ প্রত্যক্ষবিষয় হইতে পারে না, কিন্তু তথাপি বাহ্যার্থ অনুমানসিদ্ধ। চিত্তের সহিত ইন্দ্রিয়প্রণালীর দ্বারা বাহ্যার্থের সন্নিকর্ষ হইলে চিত্ত বিষয়াকারে পরিণত হয়, সুতরাং এই প্রত্যক্ষলব্ধ চিত্তবৃত্তির আকার ও অস্তিত্ব হইতে

বাহ্যার্থেরও আকার এবং অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। আত্মা সম্বন্ধেও লক্‌এর উক্তি ফরাসী-দার্শনিক ডেকার্টের উক্তিরই অনুরূপ। উত্থানলয়শীল বহুবৃত্তির অন্তরালে যে এক চিরস্থির আত্মা আছেন, তাহার প্রমাণ প্রয়োজনীয়ও নয় আর সম্ভবপরও নয়। সুখ, দুঃখ, সংশয় প্রভৃতি প্রত্যেক চিত্তবৃত্তির সহিতই আত্মবুদ্ধি ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, সুতরাং আত্মা প্রমাণসিদ্ধ না হইলেও স্বতঃসিদ্ধ। ইহা ব্যতীত, ঈশ্বর অনুমানসিদ্ধ। কোন একটি সাদি কার্য্যবস্তুর সত্তা সম্বন্ধে নিশ্চয়াত্মক যথার্থজ্ঞান হইলেই, যিনি সকল কারণের আদিকারণ এমন একটি অনাদি সত্তাও সিদ্ধ হয়। আমার সত্তা স্বতঃসিদ্ধ, সুতরাং এই আত্মসত্তা হইতে কার্য্য-কারণ-সূত্র ধরিয়া অনুমান করিলে ঈশ্বরসত্তা সম্বন্ধেও নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান হয়।

জড়জগতের নিরপেক্ষ সত্তা স্বীকার করিয়া লইয়া বৈজ্ঞানিক জাগতিক নিয়মাদি আবিষ্কার করেন। অথচ ডেকার্ট, লক প্রভৃতি দার্শনিকগণ জড়জগতের নিরপেক্ষ সত্তা স্বীকার করিলেও তাঁহারা এ বিষয়ে যে প্রমাণপ্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহা যুক্তিসহ হয় নাই। এমন কি তাঁহারা নিজেও এই প্রমাণের প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়। ডেকার্ট বলিয়াছিলেন যে, স্বপ্নদর্শনাদি স্থলে যখন বিষয়ের অবিদ্যমানতায় জ্ঞান হয়, তখন বাহ্যজগৎও যে একটি বিরাট্ স্বপ্ন

হইতে পারে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নয়। অন্যপক্ষে লক্‌ও তাঁহার জড়জগতের প্রমাণটি প্রামাণ্যহিসাবে ঈশ্বর ও আত্মা বিষয়ক জ্ঞানের অপেক্ষা নিকৃষ্টতর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। জড়জগৎ প্রমাণ করিতে গিয়া তাঁহার কি প্রকার অসঙ্গতিদোষ ঘটিয়াছিল, তাহা প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার সমসাময়িক ও পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি বহির্জগৎ সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, ইহার আছে একটি আপেক্ষিক সত্তা ও আর একটি নিরপেক্ষ সত্তা। জড়জগৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইলে যে রূপ গ্রহণ করে, তাহাতে তাহার প্রকৃত রূপটি আংশিক ভাবে বিকৃতিপ্রাপ্ত হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি এই বিষয়ীভূত জগতেরই গুণ। পৃথিবী ততক্ষণই গন্ধবতী, সলিল ততক্ষণই শীতস্পর্শবান্, আকাশ ততক্ষণই শব্দগুণসম্পন্ন, যতক্ষণ তাহারা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন জড়জগতের সহিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ না হয়, তখন ইহা একটি শব্দ-রূপ-গন্ধাদিশূন্য জড়সত্তা মাত্র। কাঠিন্য, বিস্তৃতি, আকার এবং গতি এই কয়টি জড়পদার্থের নিরপেক্ষ গুণ। এইগুলি বাহ্যেন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হইয়া মস্তিষ্কে কতকগুলি ক্রিয়া উৎপাদন করিলে চিত্ত বিভিন্ন আকারে পরিণত হয়,—এই প্রত্যর্থনিয়ত চিত্তবৃত্তিই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু প্রত্যেক চিত্ত বৃত্তিই বিষয়াকারের অনুমাপক নহে। রূপ, রস, প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত গুণাবলী চিত্তসাপেক্ষ। এগুলি জড়গুণের অনু-

মাপক নহে। অন্যপক্ষে, বিস্তৃতি, গতি প্রভৃতি জড়বস্তুর গুণগুলির সন্নিকর্ষে চিত্ত বিষয়াকারে উপরঞ্জিত হইলে এই প্রত্যক্ষলব্ধ চিত্তবৃত্তি হইতে জড়ের নিরপেক্ষ গুণাবলী অনুমিত হয়। কারণ, এ স্থলে চিত্ত ঠিক বিষয়াকারেই আকারিত।

লকের এই জড়জগৎসম্বন্ধীয় প্রমাণের প্রামাণ্য তাঁহার পরবর্ত্তী দার্শনিকগণ অনেকেই স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি নিজেও যে এ বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার দ্রব্যবিষয়ক গবেষণা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। তিনি মানিয়া লইয়াছিলেন যে, দ্রব্য পদার্থ গুণ হইতে পৃথক্। গুণসমূহ যাহাতে সমবেত হয়, তাহাই দ্রব্য। কিন্তু আবার প্রত্যক্ষলব্ধ চিত্তবৃত্তি হইতেই নিরপেক্ষ জড়জগতের সত্তা অনুমেয়; আর চিত্ত জড়াকারে পরিণত হয় বলিয়াই এই অনুমান সম্ভব হয়, সুতরাং জড়দ্রব্য অনুমান করিতে হইলে প্রথমে স্বীকার করিতে হইবে যে, চিত্ত কেবল গুণাকারেই পরিণত হয় না, পরন্তু দ্রব্যাকারেও পরিণত হইতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি স্থিরসিদ্ধান্ত হইতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন—দ্রব্যাকারে পরিণত সুস্পষ্ট চিত্তবৃত্তি নাই, পরন্তু যখন দেখা যায় যে কতকগুলি গুণের মধ্যে নিয়ত সাহচর্য্য বর্ত্তমান, তখন এই সকল গুণগুলি নিরালম্বভাবে কি করিয়া থাকিতে পারে, তাহা কল্পনা করিতে না পারিয়া আমরা একটি আধার কল্পনা করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ি এবং এই আধারকে দ্রব্য বলি। যে সকল

জড়গুণসমূহ আমাদের বৃত্তিগুলির কারণ, তাহাদের এই অচিন্তনীয় আলম্বনটিই দ্রব্য।

লকের এই বাক্য তাঁহার পূর্ব্বস্বীকৃত বাক্যের সহিত যে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন তাহা এই স্থানে উল্লেখযোগ্য। তিনি পূর্ব্বেই স্বীকার করিয়াছেন যে, ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলে যে চিত্তবৃত্তি উদিত হয় তাহাই একমাত্র প্রত্যক্ষসিদ্ধ, আর এই প্রত্যক্ষলব্ধ চিত্তবৃত্তি হইতে চিত্তেতর বস্তু অনুমেয়। তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন যে বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় এই দুইটি ব্যতীত জ্ঞানকুটীরের অন্য গবাক্ষ নাই। সুতরাং ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ না হইলে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই অসম্ভব। এই কথাগুলি স্বীকার করিলে দ্রব্যজ্ঞান অসম্ভব হইয়া উঠে। গুণাকারে বিকৃতি প্রাপ্ত চিত্ত চিত্তেতর গুণানুমানের সাধক হইতে পারে, ইহা মানিয়া লইলেও দ্রব্যাকারে পরিণত চিত্তবৃত্তির অভাবে দ্রব্যানুমান বাধিত হয়। এই জন্যই বোধ হয়, লক্ কোন কোন স্থানে স্বীকার করিয়াছেন যে, আমরা বহির্জগৎ হইতে বিষয় গ্রহণ করি, এ জ্ঞানটি প্রমাণসিদ্ধ নয়, পরন্তু স্বতঃসিদ্ধ, এবং অনেক সময় তিনি জড়বস্তুবিষয়ক জ্ঞানকে চিত্তবৃত্তিসমূহের নিমিত্তকারণাত্মক জ্ঞানে পর্য্যবসিত করিয়াছেন। জড়দ্রব্যের ও গুণের স্বরূপ দুর্জ্ঞেয় ভাবিয়াই যেন তিনি বলিয়াছেন যে, জড়বস্তু এমন একটা কিছু, যাহা নানাবিধ চিত্তবৃত্তির কারণ। আমরা রূপ, রস, গন্ধাদি যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়প্রণালীর দ্বারা গ্রহণ করি, সেগুলি আমরা নিজে

সৃষ্টি করি না; চক্ষু খুলিলে কোন্ রূপটি যে প্রত্যক্ষবিষয় হইবে তাহা দ্রষ্টার ইচ্ছাসাপেক্ষ নহে। এই জন্যই উহাদের কারণ বাহ্য জগতে আছে বলিতে হয়। কিন্তু লকের এই উক্তিটিও তাঁহার ইন্দ্রিয়বাদ হইতে উপপন্ন করা যায় না। প্রত্যেক কার্য্য বস্তুরই যে একটি কারণ আছে, এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য হইতে পারে না, অধিকন্তু সেই চিত্তবৃত্তির বাহ্য কারণটি যে জড়বস্তু, পরন্তু চৈতন্যময় নহে, তাহারও প্রমাণ তিনি দিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ লক্ জড়জগতের নিরপেক্ষ সত্তা উপপাদন করিতে পারেন নাই। ইন্দ্রিয়বাদের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন স্কট্‌ল্যাণ্ডের চিন্তাশীল দার্শনিক হিউম্। আর হিউম্ ভূয়োদর্শন ও ইন্দ্রিয়বাদকে আশ্রয় করিয়া যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহারই ফলে কাণ্টের চিন্তা-নির্ঝরিণী জীবন্ত ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

সমসাময়িক ভারতীয় দর্শন

ভারতীয় দর্শন সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলেই আমার মনে পড়ে, মানুষের একটি চির-অনুষ্ঠিত আত্মপ্রতারণার কথা। রাত্রিতে বিশ্বস্রষ্টার দিগন্তব্যাপী সুনীল প্রকোষ্ঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎ-কোষের মত যে অসংখ্য তারকাগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের অনেকেই পৃথিবী অপেক্ষা অনেক গুণে বড়, কেবলমাত্র ব্যবধানই এস্থলে উঁহাদের প্রকৃত আয়তন আবৃত করিয়া আমাদের চোখের সম্মুখে মিথ্যা-আকৃতিমাত্র প্রকটিত করে। আবার শতশত গগনস্পর্শী গিরিমালা, সুবিস্তৃত দেশ-মহাদেশ, সাগর-মহাসাগর, আর অগণিত জীব জন্তু ও সকলের উপর এই অশান্ত রহস্যজটিল মানুষগুলিকে বুকের উপরে লইয়া আমাদের যে পৃথিবীটি বিশ্বনিয়ন্তার যেন কোন্ এক গুপ্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই দিবারাত্রি অক্লান্তভাবে সূর্য্যমণ্ডলকে পরিক্রমণ করিতেছে, সেটি অনন্ত আকাশের কোটি কোটি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে একটি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বিমানসঞ্চারী গ্রহ মাত্র। বিজ্ঞানের এই বিশ্বকাহিনী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বিশ্বের মধ্যে পৃথিবীর স্থান বেশী উচ্চ বলিয়া বোধ হয় না। আর মানুষের পূর্ব্বপুরুষ ও অতীত ইতিহাস সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা সত্য হইলে আমাদের অতীত গৌরবের আবরণে বর্ত্তমানের দীনতা গোপন করিবার

অভ্যাসটাও কম হইবারই কথা। কিন্তু বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে পৃথিবী ও তাহার অধিবাসীর গৌরব ক্ষুণ্ন হইলেও যাহা সত্য ও চিরন্তন, তাহার সঙ্গে তো ব্যক্তিগত স্বার্থ বা গৌরবের কোনই সম্বন্ধ নাই। যিনি প্রকৃতই সত্যসেবক, তিনি নিজের লাভলোকসান ও দেনাপাওনার হিসাব সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রতই অবলম্বন করেন। কিন্তু মানুষ সাধারণতঃ দুর্ব্বল-চিত্ত। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ," এই মন্ত্রের প্রেরণাতে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও সে আবার ঐ দেনাপাওনার খাতাখানি খুলিয়া বসে। সন্ন্যাসী হইয়াও সে গৃহী হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গৃহী হইয়াও সে আপনাকে সন্ন্যাসী মনে করে; এইটিই তার আত্মপ্রতারণা।

ভাগ্যদেবীর কোন্ এক দুর্ব্বোধ্য ইঙ্গিতের ফলে ভারত-বর্ষের সঙ্গে সাগর-পারের পশ্চিমদেশের যখন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তখন হইতে বহুস্থলেই এই প্রকার আত্মপ্রতারণা অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল। দর্শনশাস্ত্রেও তাহার প্রভাব স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষ চিরকালই তত্ত্বচিন্তা ও আধ্যাত্মিক বিদ্যার অদ্বিতীয় আকর বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিয়াছে। সুতরাং পশ্চিমের মানুষটি যখন কেবল বাহ্যিক মণিমুক্তার সন্ধানে পরিতৃপ্ত না হইয়া তাহার চিরবিস্মৃত চিন্ময়খনির রত্ন সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইলেন, তখন ঐ দেনাপাওনার খাতাখানিই তাহার অন্তর্দৃষ্টির পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

জাতীয় গৌরব, আভিজাত্য, অভিমান প্রভৃতি রিপুগুলি একটি দুশ্ছেদ্য আবরণের মত সত্যের উপাধিমুক্ত রূপটিকে নিতান্তই অস্পষ্ট করিয়া তুলিল। আর সে সময় অধিকাংশ নবমন্ত্রে দীক্ষিত ভারতবাসীও ঐ মায়িক প্রতীকের উপাসনাতে যোগ দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। তবে সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, আধুনিক ভারতের প্রবল চিন্তাস্রোতে অতীতের কলঙ্ককাহিনী বহুদূরে ভাসিয়া গিয়াছে। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বের ভারতীয় ইতিহাসের সঙ্গে বর্ত্তমান ভারতের তুলনা করিয়া দেখিলেই এই জাতীয় চিন্তা-প্রবাহের পরিবর্ত্তন স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-সংগঠন, জড়বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠিতে জাতীয় প্রতিভার সত্যকার রূপটি আবিষ্কার করিতে শিক্ষিত ভারতবাসী উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন। এই বহুমুখী জাতীয় উদ্বোধনের পবিত্র অনুষ্ঠানে ভারতমাতার যে সকল কৃতিসন্তান পৌরোহিত্যের গুরুদায়িত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ইতিহাসের পাতায় তাঁহাদের অমরকীর্ত্তি স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিয়া ভারতের ভাবী সন্তানের শ্রদ্ধাঞ্জলি আকর্ষণ করিবেই। এই দেশব্যাপী জাগরণ আমাদের ভবিষ্যৎ মাহাত্ম্য ও উৎকর্ষের একটি মাঙ্গলিক সূচনা। কিন্তু এই শুভমুহূর্ত্তে জগতের ইতি-হাস হইতে আমাদিগকে একটি অতি প্রয়োজনীয় ও মঙ্গলময় উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রতীচীর ইতিহাসেও নবজাগরণের মাঙ্গলিক শঙ্খ একবার অতিশয় ভৈরবনাদে বাজিয়া উঠিয়াছিল। প্রায় দশশতাব্দীব্যাপী

পশ্চিমের কুম্ভকর্ণের মহানিদ্রা এই শঙ্খধ্বনিতে ভাঙ্গিয়া যায়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ধর্ম্মযাজকের সুরক্ষিত লৌহপ্রাকার যখন নবজীবনের অমিত শক্তিপ্রভাবে কম্পিত হয়, এবং মানুষের অন্তরাত্মা শাস্ত্রশৃঙ্খলের নিষ্পেষণ হইতে অব্যাহতি লাভ করে, তখন হইতে এই প্রতিক্রিয়ার অন্তরালে কতকগুলি অতিক্রিয়া আচরিত হইতে থাকে। আর তাহার ফলে পাশ্চাত্যদেশের প্রকৃত উন্নতির পথ বহুদিন পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ থাকে। মানুষের আত্মপ্রত্যয় আত্মম্ভরিতায় পর্য্যবসিত হইলে যেটি সনাতন সত্য ও মঙ্গলের পবিত্র মন্দির তাহার পথ এই ভাবেই রুদ্ধ হইয়া যায়। তখন আত্মপ্রীতি ও স্বদেশপ্রীতি স্বরূপ ছাড়িয়া অহঙ্কার ও অন্ধ গোঁড়ামিতে পরিণত হয়। তখন প্রেম হয় উন্মাদনার নামান্তর মাত্র, আর প্রেয় হয় বন্ধন ও অজ্ঞানের কারণ। এই অতিক্রিয়া ও আত্মম্ভরিতা যে চিরকালই মানুষের দৃষ্টিপথে মায়াজাল সৃষ্টি করিয়া তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া আসিয়াছে, এইটিই ইতিহাসের পাতায় সত্যান্বেষীর শিক্ষা করিবার জিনিষ।

বর্ত্তমান ভারতের দার্শনিক-চিন্তা পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রবাহটি প্রধানতঃ দুইটি ধারাতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। একদিকে আমাদের অতীত গৌরবের স্তম্ভস্বরূপ সংস্কৃত পণ্ডিতগণ পূর্ব্বপ্রথামত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে জীবনের একটি মুখ্যধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া যথাসাধ্য দর্শন

শাস্ত্রের সনাতন প্রবাহটিকে সঞ্জীবিত করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যদিকে ইংরাজীভাষাভিজ্ঞ দার্শনিকগণ পাশ্চাত্যচিন্তার সচল স্রোতটিকে ভারতীয় চিন্তার প্রশান্ত বারিধির অভিমুখে নিয়ন্ত্রিত করিয়া নিত্য পরিবর্ত্তনশীল নূতন কলেবরে সেই চিরপুরাতন প্রাণস্পন্দনটির অন্বেষণে ব্যস্ত হইয়াছেন। এই শেষোক্ত ধারাটি আবার দুইটি শাখাতে বিভক্ত। একটি প্রাচীন ভারতের ভাবধারার সঙ্গে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত। অন্যটি সদ্যঃজাগ্রত নির্ঝরিণীর মতই উদ্দামময়ী ও অসংযত। বর্ত্তমান ভারতীয় দর্শনে এই বিভিন্নমুখী প্রবাহ দুইটির সুস্পষ্ট পরিচয় শঙ্কর দর্শনের আধুনিক সমালোচনাগুলির মধ্যেই পাওয়া যায়। সুতরাং এ বিষয়ে দুই একটি কথা না বলিলে আজকার বক্তব্য বিষয়টি নিতান্তই অসম্পূর্ণ থাকিবে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ শিক্ষানিকেতনেই জাতীয় দর্শন শিক্ষার যে একটা দেশব্যাপী প্রচেষ্টা চলিতেছে তাহার ফলে বেদান্ত দর্শনের মত অন্য কোনও দর্শনই বোধ হয় এতটা প্রসার ও পুষ্টি লাভ করে নাই। বেদান্ত বিষয়ে এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যতগুলি সুচিন্তিত পুস্তক ও প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছে, অন্য কোন ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে তাহার তুলনা হয় না। আবার বেদান্ত দর্শনের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের ভাবগাম্ভীর্য্য ও তর্ককুশলতা সুধীমণ্ডলীর দৃষ্টি যে ভাবে আকৃষ্ট করিয়াছে, তাহাতে অল্পদিনের মধ্যেই লক্, হিউম্, কাণ্ট, বার্গসঁ-এর

মতনই শাঙ্করদর্শনও যে বিদ্যার্থীর অবশ্য-পাঠ্য হইয়া দাঁড়াইবে, এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নাই।

শাঙ্কর বেদান্তের উপর ইউরোপীয় দর্শনের প্রভাবই বর্ত্তমান যুগের জাতীয় দর্শনের বিশেষত্ব। ভারতীয় দর্শন ও প্রাচীন গ্রীক দর্শনের মধ্যে আদান-প্রদান লইয়া পণ্ডিতগণ বহুপ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাহার কারণ, এই দুইটি বিভিন্ন-দেশীয় চিন্তাপ্রবাহের সাদৃশ্য ও কতকগুলি সিদ্ধান্তের প্রকৃতিগত ঐক্য। এই আদান-প্রদানের সমর্থক কতকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনাও যে নাই, তাহা নহে। কিন্তু সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য থাকিলেই যে আদান-প্রদানই তাহার একমাত্র কারণ তাহাও নিশ্চিত-ভাবে বলিতে পারা যায় না। মানুষ মাত্রেরই চিন্তাপ্রণালী কতকগুলি মূলসূত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং বিভিন্ন দেশ ও বিভিন্ন সময়ের চিন্তাধারার মধ্যেও একটা মূলগত সাদৃশ্য থাকিয়া যায়। চিন্তার ঐ চিরন্তন রূপটি প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য জাগতিক বস্তুর ন্যায় পরিবর্ত্তনশীল নয়। পরন্তু দেশকালস্পৃষ্ট বিকারশীল ঘটনাপুঞ্জ অনেকটা শাস্ত্রকথিত উপাধির মতন হইয়া যাহা এক ও সনাতন তাহাকে বহুরূপী করিয়া প্রকটিত করে। এই উপাধিমুক্ত চিন্তার সনাতন রূপটি বহু যুগ ধরিয়াই দার্শনিক-গণের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ প্রত্যক্ষ-ভাবে, কেহ বা পরোক্ষভাবে ইহার সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু অনেকেই পরিধিস্থিত সাদৃশ্যকে কেন্দ্রস্থ ঐক্য ভ্রমে আলি-

ঙ্গন করাতে তাঁহাদের চিন্ময় অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। এই কেন্দ্রস্থিত সনাতন বস্তুটিই বিভিন্ন দেশের দর্শনশাস্ত্রের সাদৃশ্যের কারণ। শাঙ্কর বেদান্তে পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে যে দুইটি নূতন প্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে একটি অতীব চিত্তাকর্ষক এবং সম্পূর্ণভাবেই নূতন; এবং পরিধি ও কেন্দ্রের ব্যবধান লুপ্ত হওয়াতেই এই অভিনব বেদান্ত-ব্যাখ্যা সম্ভবপর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। যুগে যুগে দার্শনিক-গণ যে সকল দুরূহ প্রশ্ন লইয়া জীবনব্যাপী সাধনা করিয়াছেন, তাহাদের কতকগুলি দেশ কাল নির্ব্বিশেষে চিন্তাশীল ব্যক্তি-মাত্রেরই অন্তরের প্রশ্ন। কিন্তু কতকগুলি সমস্যা পারিপার্শ্বিক ঘটনা সমূহ অবলম্বন করিয়াই জন্মগ্রহণ করে, সুতরাং এই সমস্যা-গুলি ও তাহাদের সমাধান-প্রণালী সকল সময়ের ও সকল দেশের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এইজন্য পাশ্চাত্য দর্শনের নিখিল সমস্যার পূর্ণ সমাধান ভারতীয় দর্শনে পাওয়া যে প্রকার অসম্ভব, তেমনই আবার ভারতের জাতীয় দর্শনের সকল প্রশ্নই পাশ্চাত্য দর্শনে থাকাও সম্ভব নয়। এই সহজ সত্যটির প্রতি উপেক্ষাই যে পূর্ব্বোক্ত কেন্দ্র-ভ্রান্তির কারণ, তাহা স্থানান্তরে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

শাঙ্কর বেদান্তের চির-প্রচলিত ব্যাখ্যা অনুসারে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, জগৎ, জীবাত্মা প্রভৃতির স্বরূপ যে ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অধুনাতন পণ্ডিতগণ সমধিক কৃতিত্ব ও বুদ্ধিমত্তার সহিত ঐ পুরাতন ব্যাখ্যা খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার ঐ প্রাচীন

ব্যাখার জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণকেই দোষী সাব্যস্ত করিয়াছেন। অবশ্য, এ দোষস্থাপনা আদৌ যুক্তিসহ নয়, কারণ প্রাচীন ব্যাখ্যাটি বহু শতাব্দী হইতেই ভারতবর্ষের পণ্ডিতগণ শাঙ্কর বেদান্তের সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। যদি এ বিষয়ে অপব্যাখ্যা প্রচলিত থাকে, তবে তাহার জন্য বৈদেশিক পণ্ডিতগণই যে দায়ী তাহা বলিতে পারা যায় না চির প্রচলিত সিদ্ধান্ত অনুসারে শঙ্করাচার্য্য শুদ্ধ বা নির্ব্বিশেষ অদ্বৈতবাদী। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, আর জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, এই তত্ত্বগুলিই শাঙ্কর বেদান্তের মুখ্য প্রতিপাদ্য বস্তু বলিয়া আবহমান কাল হইতেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া আসিয়াছে। এক অদ্বিতীয় ত্রিবিধ ভেদশূন্য অপরিণামী চিন্ময় ব্রহ্মই সত্য; আর সমস্তই নামরূপাত্মক অনির্ব্বচনীয় মায়াশক্তির প্রভাবে ব্রহ্মেতর বস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শাঙ্কর বেদান্তের এই মূল প্রস্রবণটি পাশ্চাত্য-দর্শনের চিন্তাপ্রবাহে মিলিত হইয়া যে অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা বাস্তবিকই অদৃষ্টপূর্ব্ব। আর এই অভিনব টীকাতে যে প্রকার পাণ্ডিত্য ও চিন্তাগাম্ভীর্য্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদের একটী স্পর্দ্ধা ও শ্লাঘার বিষয় সন্দেহ নাই। যে ভারতে কেবলমাত্র উপনিষদের কতকগুলি জটিল দুর্ব্বোধ্য বাক্য অবলম্বন করিয়া, জৈমিনি, বাদরায়ণ, গোতম, কপিল প্রভৃতি মনীষিগণের বিভিন্ন মত-পোষক সূত্রাত্মক দর্শনগুলি গড়িয়া উঠে; যেখানে সূত্রাত্মক দর্শনকে সারভূত বাক্য করিয়াও, শবরস্বামী

শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, বাৎস্যায়ন, বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি দার্শনিকগণ আপন আপন চিন্তা-চাতুর্য্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; আর কাত্যায়ন, উদ্যোতকর, কুমারিল প্রভৃতি বার্ত্তিককারগণ মূলতত্ত্ব পরিব্যক্ত করিবার অজুহাতে নিজেদের মৌলিকতা ও স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়াছেন; যেখানে গঙ্গেশ, রঘুনাথ, গদাধর, জগদীশ প্রভৃতি তার্কিকের মৌলিক যুক্তির অভিনব প্রণালী যুদ্ধান্তে অস্ত্র-ঝঞ্ঝনার পরিশিষ্ট ক্ষীণ শব্দের মতন এখনও বিপুল ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হইতেছে,—সেই ভারতে যে শাঙ্কর বেদান্তের আরও একটি নূতন ব্যাখ্যা হইবে সেটা খুবই স্বাভাবিক।

এই নূতন টীকার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে সিদ্ধান্তটি ইহার নূতনত্বের চরমবিকাশ ও বৈদেশিক প্রভাবের অভ্রান্ত নিদর্শন, সেইটি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। শাঙ্কর বেদান্তে ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধ কি? এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়াই নূতন টীকাটি গড়িয়া উঠিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য অনেকস্থানেই স্পষ্ট বাক্যে জগৎকে মিথ্যা ও মায়াময় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জগৎকে ব্রহ্মেতর বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্মকে ভূমা প্রতি-পাদন করা যায় না; যে বস্তু ভূমা, তাহাতে জ্ঞাতা জ্ঞেয়, দ্রষ্টা দৃশ্য প্রভৃতি দ্বৈত ব্যঞ্জক সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব; ব্রহ্ম সর্ব্ববিকল্পশূন্য, প্রপঞ্চোপশম। ব্রহ্ম সৎ, দ্বৈত অসৎ; জগৎ প্রপঞ্চ অসৎ বলিয়া তাহার উৎপত্তি প্রলয় শশবিষাণাদির

উৎপত্তি প্রলয়ের মতনই অসম্ভব। এই প্রকার সিদ্ধান্ত আচার্য্যের ভাষ্যগুলির মধ্যে বহু স্থলে বিভিন্নভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। তা ছাড়া জগৎকে অসত্য ও মৃগ-মরীচিকা, রজ্জুসর্প প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করাতে রামানুজ-প্রমুখ বৈদান্তিক এবং জয়ন্তভট্ট প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ শাঙ্কর বেদান্তের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং আচার্য্যের নিজের উক্তি এবং অন্যান্য দার্শনিকদিগের খণ্ডনচেষ্টা, এই দুই দিক্ দিয়া বিচার করিলে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, শঙ্করাচার্য্য গ্রীক্-দার্শনিক প্লেটো ও পার্মেনাইডিস্‌এর ন্যায় এক অদ্বিতীয় সদ্-বস্তু ব্যতীত অন্যান্য জাগতিক বস্তুগুলিকে মিথ্যা বা অসত্য প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টাই করিয়াছেন। এই সত্য প্রতিপাদন করিতে আচার্য্য যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন তাহার মধ্যে শাস্ত্রদৃষ্টি ও যুক্তিদৃষ্টি এমনি অঙ্গাঙ্গিভাবে অনুস্যূত হইয়াছে যে, তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া পর্য্যায়ভুক্ত করা সুকঠিন। কিন্তু এই ভাবে পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া না দেখিলে অনেক স্থলেই তাঁহার বাক্যগুলি অসঙ্গতি-দুষ্ট হইয়া পড়ে। তিনি একদিকে যেমন শাস্ত্রদৃষ্টিলব্ধ তত্ত্বকে যুক্তিসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই যুক্তিদৃষ্টিকে শাস্ত্রদৃষ্টির শাসনাধীন করিয়া যুক্তি-প্রামাণ্যের গৌরব ক্ষুণ্ণও করিয়াছেন। এমন কি, যুক্তিদৃষ্টির অপ্রামাণ্য যুক্তিসিদ্ধ করিতে গেলে যুক্তিদৃষ্টিরই প্রামাণ্য-স্বীকার অপরিহার্য্য হইয়া উঠে, ইহা জানিয়াও তিনি শাস্ত্র-প্রামাণ্যকেই রবিজ্যোতির সঙ্গে তুলনা করিয়া স্বপ্রকাশ বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন এবং

লৌকিক প্রমাণগুলি ভেদদুষ্ট বলিয়া তাহাদের চরমপ্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। সুতরাং আচার্য্যের প্রকৃত অভিমত বুঝিতে হইলে তাঁহার শাস্ত্রদৃষ্টিলব্ধ তথ্যগুলিকেই প্রধান করিয়া লওয়া একান্ত আবশ্যক। যুক্তিদৃষ্টিতে পরিদৃশ্যমান জাগতিক বস্তুসকল সত্য, প্রত্যক্ষদৃষ্ট জগৎপ্রপঞ্চকে অসৎ বলা উন্মাদের পক্ষেই সম্ভব। এই জগতের সত্তা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু ও প্রাতিভাসিক পদার্থের সত্তার অপেক্ষাও সত্য; কিন্তু প্রপঞ্চ ব্যাবহারিক দশাতে সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে অসৎ। আবার ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জগৎ গগনকমলিনী বা শশবিষাণের ন্যায় অলীক নয়; পরন্তু শাস্ত্রোক্ত সাধন প্রণালী দ্বারা সাধারণ প্রমাণগুলি যখন বিশুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয়, তখন পারমার্থিক দৃষ্টির পূত জ্যোতির প্রভাবে ব্রহ্মেতর বস্তু অলীক ও তুচ্ছ বলিয়াই জানিতে পারা যায়। যতক্ষণ রজ্জুকে জানিতে পারা যায় না, ততক্ষণই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয় এবং এই সর্প দৃষ্টিদোষে প্রত্যক্ষজ্ঞানেরই বিষয় হয়। কিন্তু সত্যজ্ঞান দ্বারা সর্পজ্ঞান বাধিত হইলে, তখন জানা যায় যে, বাস্তবিক পক্ষে রজ্জু কোন কালেই সর্পরূপে পরিণত হয় নাই, আর সর্পও কোন কালেই সত্যবস্তু ছিল না। যাহা নিতান্তই অলীক, তাহা ব্যাবহারিক দশাতে প্রত্যক্ষবিষয় করিতে পারে এই যে ব্রহ্মশক্তি তাহাই মায়া, আর সেই জন্যই মায়া অনির্ব্বচনীয়া। শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতসিদ্ধির এই কথা কয়টি মেরুদণ্ডস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

তবে তাঁহার এই উদ্যম কতদূর সফল হইয়াছে, সে-বিষয়ে পণ্ডিতগণের মতদ্বৈধ দেখা যায়। অনেক চিন্তাশীল প্রাচীন ও নবীন পণ্ডিতগণের মতে আচার্য্যের অদ্বৈতসাধন ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদকে সম্পূর্ণভাবে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারেন নাই। আচার্য্যের আধুনিক টীকাকারগণের মতে কিন্তু এটি ইষ্টাপত্তি। কারণ, তাঁহারা বলেন যে, শঙ্করাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ এবং ভেদাভেদবাদ বস্তুতঃ একই জিনিষ। তিনি ব্রহ্মেতর বস্তুকে অসত্য বা মায়াময় বলিয়াছেন সত্য কিন্তু জগৎকে শশবিষাণের ন্যায় অলীক বলেন নাই। সুতরাং জগৎ যে একটা স্বতন্ত্র বা স্বাধীন বস্তু নয়, পরন্তু ব্রহ্মই যে তাহার অধিষ্ঠান, এই সত্যটি অভিব্যক্ত করিবার জন্যই শাঙ্কর বেদান্তে জগৎকে মিথ্যা বলা হইয়াছে। স্বাধীন বা ব্রহ্ম নিরপেক্ষ জগৎ অসত্য পরন্তু ব্রহ্মাধিষ্ঠিত জগৎ সত্য। আচার্য্যের সিদ্ধান্তের এই স্বরূপটি গ্রহণ করিতে না পারিয়া অনেকে বহুকালাবধি শাঙ্করবেদান্তের অপব্যাখ্যা করিয়া আসিতেছেন। এই ভাবে জগতের অলীকতা যে আচার্য্যের অভিপ্রেত ছিলনা তাহা দেখাইয়া নব্যটীকাকারগণ বিভিন্ন প্রকারে ব্রহ্ম ও জগতের আপেক্ষিক সম্বন্ধটিকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ বলেন যে, বিকারশীল জগৎ একটি অবিকৃত দেশকালাতীত চিন্ময়সত্তাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে; সুতরাং সম্বন্ধটি কেবল আশ্রয় ও আশ্রিতের সম্বন্ধ। অন্যমতে জগৎ ব্রহ্ম-বস্তুরই বিকাশ বা

অভিব্যক্তি, জগৎ একটি দেশকালাতীত ব্রহ্মবস্তুর স্বরূপের দেশকালে বিকাশ, এবং সেই জন্যই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতে পারে না। প্রথম মতে ব্রহ্ম জগতের অধিষ্ঠান মাত্র, দ্বিতীয় মতে জগৎ ব্রহ্মের অভিব্যক্তি। এই পার্থক্যটুকু বাদ দিয়া দেখিলে উভয় মতেই জগতের অলীকতা শাঙ্কর বেদান্তের প্রতিপাদ্য নয়। সুতরাং শঙ্করের দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিশিষ্টাদ্বৈতবাদেরই নামান্তর মাত্র। এইস্থানে প্রাচীন ও নবীন ব্যাখ্যার মূল পার্থক্যটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব্বমতে শাঙ্কর বেদান্তের যে স্থানগুলি যুক্তিদৃষ্টিতে সুদৃঢ় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, নবীন ব্যাখ্যাতে সেইস্থান গুলিই বেদান্তের স্তম্ভস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে, এই নূতন ব্যাখ্যার পাণ্ডিত্য-কৌশলে শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক হিসাবে পদোন্নতিই হইয়াছে মনে হয়। কারণ, পাশ্চাত্য চিন্তার ইতিহাসে Hegel হইতে আরম্ভ করিয়া Stirling, Green, Caird, Bosanquet, Bradley প্রভৃতি চিন্তাশীল দার্শনিকগণ পূর্ব্ব দার্শনিকগণের শুদ্ধাদ্বৈতবাদকে ভ্রান্তিসঙ্কুল ও অযৌক্তিক বিবেচনা করিয়া এক প্রকার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই একমাত্র যুক্তিসহ সিদ্ধান্ত বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। এই নূতন ও পুরাতন ব্যাখ্যার তুলনা-মূলক সমালোচনা আজকার অভিভাষণের অঙ্গীভূত নয়। সুতরাং কেবলমাত্র দুই একটি মোটামুটি মন্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াই প্রবন্ধটি শেষ করিব।

পাশ্চাত্যদর্শনে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলি দিয়া ভারতীয় চিন্তার রূপ প্রকাশ করা ও এই দুটি চিন্তাপ্রবাহের সাদৃশ্য দেখাইয়া তাহাদের আপেক্ষিক শ্রেষ্ঠতা ও উৎকর্ষ প্রদর্শন করা যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনই ফলপ্রসূ, সন্দেহ নাই। কিন্তু কয়েকটি বিষয় মনে রাখিতে না পারিলে এই উদ্যম সফল হওয়া তো দূরের কথা, পরন্তু একটা জাতীয় অকল্যাণেরই দ্বার উন্মুক্ত হইবে।

প্রাচীন ভারতের দার্শনিকগণ দর্শনশাস্ত্রকে কেবল মাত্র তর্কপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত বলিয়া বিবেচনা করিতেন না; পরন্তু মনুষ্যজীবনের পরম পুরুষার্থ লাভ করিবার যে সকল প্রথা প্রচলিত ছিল. দর্শনশাস্ত্র তাহারই একটি উপায় বলিয়া মনে করিতেন। পরস্পারের সিদ্ধান্ত খণ্ডন ও সমর্থন করিতে গিয়া দার্শনিকদের মধ্যে মতদ্বৈধ সৃষ্টি হইয়াছে সত্য, কিন্তু দর্শনশাস্ত্র যে সাধনের একটি অঙ্গ, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ ছিল না। সুতরাং সকলকেই বৈরাগ্য যোগাভ্যাস প্রভৃতির সহযোগে সত্যনিরূপণ করিতে হইত। আত্মা চিদ্‌ঘন আনন্দস্বরূপই হউন, কিংবা পঞ্চস্কন্ধ রূপ শূন্যই হউক, এই নিখিল ক্লেশের মূল সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে আত্মসাক্ষাৎকার দরকার। যাঁহারা নিবৃত্তিধর্ম্মের সাধনা করিতেন, তাঁহাদের পক্ষে শাশ্বতী শান্তির অন্য কোন উপায় ছিল না। এই আত্মসাক্ষাৎকার হইবার শাস্ত্রোক্ত পন্থাটি সাধারণ ভাবে তত্ত্বনিরূপণের পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইত।

তত্ত্বগুলির সংখ্যা ও রূপ বিষয়ে দার্শনিকগণের মতদ্বৈধ থাকিলেও পন্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনই সন্দেহ ছিল না। ঐ তত্ত্বনিরূপণে যুক্তি ও তর্কের স্থানটি পশ্চিমের যুক্তিবাদিগণের নির্দ্দিষ্ট স্থানের অনুরূপ নয়, বরং এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশে মধ্যযুগের দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তের সহিত ভারতীয় দার্শনিকের সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় মতেই শাস্ত্রদৃষ্টিকে যুক্তিদৃষ্টির উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে। পশ্চিমে যেটিকে বর্ত্তমান যুগ বলা হয়, তাহার প্রারম্ভে দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকলেই ঐ মধ্যযুগের সিদ্ধান্তটি পরিত্যাগ করেন; তাঁহাদের বিশ্বাস যে, শাস্ত্রদৃষ্টিকে যুক্তিদৃষ্টির উপরে স্থান দেওয়ার জন্য মানুষের দৃষ্টির পথে কতকগুলি কুসংস্কার স্তূপীকৃত হইয়া জ্ঞানের পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে। এই বিশ্বাসের ফলে এক দিকে মানুষের নিজের বুদ্ধি ও অনুভবের উপর আস্থা বৃদ্ধি হইল, অন্যদিকে যে সকল বস্তু প্রত্যক্ষ অনুমানাদির অগোচর সেগুলি আবর্জ্জনাস্তূপেই স্থান পাইল। কিন্তু কালক্রমে এই শাস্ত্রশৃঙ্খলমুক্ত চিন্তাপ্রবাহের অন্তরালে আর একটি অন্তর্ব্বাহিনী গুপ্তস্রোতস্বিনীর সৃষ্টি হয়; আর তাহার কারণ ছিল মানুষের কতকগুলি মজ্জাগত সংস্কার—যেগুলি মুখে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিলেও অন্তরের গুপ্তসিংহাসনে অটল ও নিশ্চল হইয়া বসিয়া থাকে। প্রত্যক্ষ অনুমানাদি লৌকিক অনুভবগুলিকে ভিত্তি করিয়া যে জ্ঞানমন্দির প্রতি-

হইল, তাহাতে এই অন্তরতম সংস্কারের দাবী মোটেই

পূর্ণ হইল না। কিন্তু দার্শনিক পূর্ণ-সমন্বয়ের পক্ষপাতী বলিয়া, লৌকিক অনুভবের অন্তরালে আর একটি দেশকালাতীত রাজ্য খাড়া করিয়া ঐ সংস্কারগুলির প্রসাধন করিতে বাধ্য হইলেন।

যাঁহারা এই প্রকার সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দার্শনিক-শ্রেষ্ঠ কাণ্টের স্থান সর্ব্বোচ্চ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কাণ্টের দর্শনে যে সকল বিভিন্নপ্রকারের সমন্বয় সাগরে নদীসম্মেলনের মতন একস্থানে মিলিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ এখানে অসম্ভব এবং অপ্রাসঙ্গিক। এইটুক মাত্র এখানে বলা দরকার যে তাঁহার চিন্তাসম্পদ্‌গুলি একদিকে যেমন মানুষের আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে তেমনি তাহার আত্মম্ভরিতা খর্ব্ব করে। মধ্যযুগের দার্শনিকদিগের বিবেচনাতে মানুষ একটি পাপস্পৃষ্ট জীব, সুতরাং তাহার বুদ্ধিবৃত্তিকে কখনই প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না; সকল বিষয়েই শাস্ত্রবাণীই প্রমাণ। অন্যদিকে বর্ত্তমানযুগের প্রারম্ভ হইতে প্রায় দুইশতাব্দীকাল পর্য্যন্ত দার্শনিকগণ নিজের বুদ্ধি ও অনুভবকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। কাণ্টের মধ্যে এই দুইটীর সমন্বয় হয়। তিনি এক অভিমত অশ্রুতপূর্ব্ব পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া প্রমাণ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং প্রমাণ সম্বন্ধে তাঁহার সিদ্ধান্ত হইল এই যে, মানুষের জ্ঞান দ্বৈতাত্মক;

বিজ্ঞাতা ও বিজ্ঞেয়, বিষয় ও বিষয়ী, এই ভেদ সর্ব্বব্যাপী। সমস্ত লৌকিক প্রমাণই দ্বৈতদুষ্ট, আর দেশকালাবচ্ছিন্ন জগতের মধ্যেই লৌকিক প্রমাণগুলির প্রামাণ্য সর্ব্বতোভাবে গণ্ডীবদ্ধ; এই জগতের সীমার মধ্যে লৌকিকদৃষ্টিতে নির্ভরশীল বৈজ্ঞানিকের সত্যনির্ণয়পদ্ধতিতে কোনই শঙ্কা হইতে পারে না। কিন্তু লৌকিক প্রমাণের অগোচর দেশকাল দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে সত্তা, তাহাকে এভাবে জানা যায় না। সেই হেতু উহা অবাঙ্‌মনসগোচর। ঐ উপাধিমুক্ত সত্তা কেবল মাত্র একটি কাল্পনিক বস্তু কিনা, এবং যাহা জানিবার উপায় নাই তাহা নিতান্তই অসৎ কিনা, এই বিষয়ে কাণ্ট যে সকল তথ্য প্রচার করিয়াছেন তাহা বহু পণ্ডিতেরই বিবেচনায়— অসঙ্গতিপূর্ণ, সুতরাং বিশ্বাসের সম্পূর্ণভাবে অযোগ্য। বিশেষ করিয়া হেগেল-প্রমুখ দার্শনিকগণ অবাঙ্‌মনসগোচর সত্তা মানিতে পারেন নাই। হেগেলের বিবেচনাতে জ্ঞানমাত্রই দ্বৈতাত্মক হইলেও সেটা দোষের কথা মোটেই নয়। ভেদই যখন জ্ঞানের সর্ব্বব্যাপী স্বরূপ, তখন যাহা সত্য তাহাই ভেদাত্মক হইতে বাধ্য। সুতরাং, যাঁহারা লৌকিক জ্ঞানকে ভেদদুষ্ট ভাবিয়াও একটি অবাঙ্‌মনসগোচর সত্তা সত্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদের কথা আদৌ যুক্তিযুক্ত নয়। আবার কোন কোন পণ্ডিতগণ লৌকিক প্রমাণের সত্যনির্ণয় বিষয়ে সন্দিহান হইয়া একপ্রকার অসাধারণ দৃষ্টিকেই একমাত্র প্রমাণ বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন, তাঁহাদের অভিমতও হেগেল

যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন নাই। দেশকালের অতীত একটি সত্যবস্তু ভেদাত্মক প্রমাণদ্বারা আত্মপ্রকাশ করে, সে বিষয়ে হেগেলের কোনও সন্দেহ ছিল না। তবে সে বস্তুটি ভেদ-বিরোধী দ্বৈতাতীতও নয়; আর অনির্ব্বচনীয় বা যুক্তিদৃষ্টির অগ্রাহ্যও নয়।

পাশ্চাত্যদর্শন সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, পশ্চিম ও পূর্ব্বের চিন্তাপ্রবাহ পরস্পর সদৃশ হইলেও তাহাদের মধ্যে একটি মজ্জাগত ব্যবধান আছে। ভারতীয় দর্শন, যে প্রমাণপদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সত্যনির্ণয় করিতে চায় তাহা একটি সাধনার পদ্ধতি; যুক্তি ও তর্ক সে পদ্ধতির সারকথা নয়। সেইজন্য শাস্ত্রদৃষ্টির সুতীক্ষ্ণ শাসনের মধ্যেই যুক্তি-তর্ককে সংযত রাখিতে হয়। এখানে এই শঙ্কা স্বাভাবিক যে, তবে কি ভারতীয় দর্শনোক্ত শাস্ত্রদৃষ্টি একটা অন্ধবিশ্বাস মাত্র। ইহার উত্তরে বলা দরকার যে অনেক দার্শনিকের পক্ষে শাস্ত্রের উপর আস্থা নিতান্তই অন্ধবিশ্বাসের অনুরূপ হইলেও ভারতীয় দর্শনের সত্যকার ভিত্তি একপ্রকার অলৌকিক দৃষ্টি। সেইজন্য, তর্কমুখে দার্শনিক যে সকল কথা বলেন, তাহাকে চরমসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নয়। কোন কোন সময় বিচার-বুদ্ধির প্রাধান্যবশতঃ দার্শনিকের শাস্ত্রদৃষ্টি আংশিকভাবে অবরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু শাস্ত্রদৃষ্টিই ভারতীয় দার্শনিকের চরম প্রমাণ। এক চার্ব্বাক

ব্যতীত অন্য কেহই ইহা অতিক্রম করিয়া যান নাই। এমন কি, যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য মানেন না, তাঁহারাও অলৌকিক দৃষ্টিকেই চরম-প্রমাণ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। এই অলৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্বদর্শী পুরুষগণ ঋষিপদবাচ্য হইতেন। আর এই ঋষিবাক্যই শাস্ত্রবচন। এমন কি, যে নৈয়ায়িকের তর্কনিষ্ঠার জন্য শঙ্করাচার্য্য পুনঃপুনঃ শ্লেষপূর্ণ কটাক্ষ করিয়াছেন, তাঁহাকেও শাস্ত্র মানিতে হয়। বাৎস্যায়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ তর্কযুক্তির উপরে শাস্ত্রবাণীকে স্থান দিয়াছেন; অলৌকিক প্রত্যক্ষই যে সকল দর্শনেরই ভিত্তিস্বরূপ তাহা নৈয়ায়িক শিরোমণি উদয়নাচার্য্য আত্মতত্ত্ববিবেকে স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া দিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনোক্ত শব্দস্মৃতিসংস্কারের দ্বারা শব্দময় চিন্তা পরিহার, বেদান্তদর্শনোক্ত অপরোক্ষ-অনুভূতি প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি ভারতীয় দার্শনিকের প্রত্যক্ষাত্মক অলৌকিক অনুভবের উপর কি প্রকার শ্রদ্ধা ছিল এবং নিরবলম্বন যুক্তিদৃষ্টির উপর কি প্রকার অশ্রদ্ধা ছিল তাহা স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দেয়।

শঙ্করাচার্য্যের চিন্তাসম্পদের ভিতর যখন আমরা কাণ্ট বা হেগেলের যুক্তি-চাতুর্য্যের পরিচয় পাইবার চেষ্টা করি, তখন পূর্ব্বোক্ত ব্যবধানটির কথা প্রায় বিস্মৃত হইয়া যাই, আর তাহার ফলে, আচার্য্য বিচারমুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহাকেই শাঙ্কর-বেদান্তের চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করি।

আচার্য্য কিন্তু স্পষ্টভাষাতে পুনঃপুনঃ বলিয়াছেন যে, তর্কযুক্তি দ্বারা ব্রহ্মসিদ্ধি হইতে পারে না; আর তাঁহার মতে বেদান্তদর্শন শাস্ত্রবচনেরই পরিব্যক্তি মাত্র। যাঁহারা তত্ত্বদর্শন করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে যুক্তিতর্কাদি সহকারী মাত্র হইতে পারে। শাস্ত্র বচন যে অমূলক নয়, এই বিশ্বাসটুকু যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে: কিন্তু তত্ত্বদর্শন ব্যতীত শাস্ত্রোক্ত-তত্ত্ব অকাট্য সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে না। সেইজন্য আচার্য্যের ভাষ্যে তুইটি প্রমাণপদ্ধতি পাশাপাশি স্থান পাইয়াছে। কোন স্থানে উপনিষদ্ ভগবদ্গীতা প্রভৃতি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, আবার কোন স্থলে যুক্তি প্রয়োগ করিয়া ভিন্নমতাবলম্বী দার্শনিককে স্তব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। শাস্ত্রদৃষ্টি ও যুক্তিদৃষ্টি, ব্যবহারিক-অবস্থা ও পারমার্থিক অবস্থা, স্বাভাবিক দৃষ্টি ও পারমার্থিক দৃষ্টি — এই সকল বিভাগ একদিকে যেমন আচার্য্যের বক্তব্যগুলি স্পষ্ট করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনই ব্যাখ্যা-বিভ্রাটেরও কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যখন নব্যটীকাকারগণ হেগেল ও তাঁহার মতাবলম্বী দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত শাঙ্কর-বেদান্তের সিদ্ধান্তের সহিত সর্ব্বতোভাবে এক বিবেচনা করিয়া চিরপ্রচলিত বেদান্ত-ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা জ্ঞানে পরিহার করেন, তখন ভাবিয়া দেখা দরকার যে, এই সকল অলৌকিক দৃষ্টিতে আস্থাহীন দার্শনিকের যুক্তিপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত, ও লৌকিক-প্রমাণে আস্থাহীন আচার্য্যের শাস্ত্রপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য দেখাইলেই

বাস্তবিকপক্ষে শঙ্করাচার্য্যের দার্শনিক হিসাবে পদোন্নতি হইল কি না। বেদান্তশাস্ত্র যে পারমার্থিক দৃষ্টিকে চরম প্রমাণ জ্ঞানে এক অদ্বিতীয় ত্রিবিধভেদশূন্য সন্মাত্র বস্তুকে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা যদি কেবল মাত্র যুক্তিদৃষ্টিলভ্য হইত, তাহা হইলে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি সম্পত্তিনিচয়ের সাধনা একটি কুসংস্কারাচ্ছন্ন দৃষ্টির মোহকুহেলিকা ব্যতীত অন্য কিছুই হইতে পারে না। কারণ কেবলমাত্র তর্কযুক্তি আশ্রয় করিয়া বৈদেশিক পণ্ডিতগণ যে সত্যে উপনীত হইয়াছেন, তাহার জন্য শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া. বা বৈরাগ্য যোগাভ্যাসের সুকঠিন প্রণালী অনুসরণ করা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক ও পণ্ডশ্রমমাত্র। সুতরাং শঙ্করাচার্য্য-প্রমুখ ভারতীয় দার্শনিকগণ যখন অলৌকিক-দৃষ্টি সত্যনির্ণয়ের একমাত্র পন্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে. প্রাচীন ভারতের দার্শনিকগণের যুক্তিশক্তি নবীন ভারতের পক্ষে বিশেষ শ্লাঘার বিষয় নয়। নতুবা ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, যোগবৈরাগ্য সত্যান্বেষীর পক্ষে পণ্ডশ্রম জানিয়াও কেপ্‌লার, গ্যালিলেও প্রভৃতি প্রতীচীর পণ্ডিতগণের ন্যায় কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের ক্রোধানল হইতে আত্মরক্ষার্থ প্রাচীর আচার্য্যগণও শাস্ত্রবাণীর প্রামাণ্য মানিয়াছিলেন। নব্যটীকাকারগণ এ বিষয়ে কি বলিবেন জানি না।

ভারতের অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বহুপ্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। কেহ বা ইহাকে অভ্রভেদী চিন্ময়গিরির

অত্যুচ্চ শৃঙ্গের সহিত তুলনা করিয়া সসম্ভ্রমে অবনতশির হইয়া ভারতীয় চিন্তাগাম্ভীর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। আবার কেহ বা ইহাতে ধর্ম্মভাবপ্রবণ হৃদয়ের অসম্বদ্ধ উচ্ছ্বাসকে যুক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার ব্যর্থ প্রয়াস ব্যতীত আর কিছু দেখিতে না পাইয়া অদ্বৈতবাদকে যুক্তিপ্রাণ দর্শনশাস্ত্রের পর্য্যায়ভুক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছেন। এই দুই প্রকার অভিমত সাধারণদৃষ্টিতে বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইলেও শাঙ্কর-বেদান্ত সম্বন্ধে তাহাদের আংশিক সত্যতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আচার্য্যের নিজের বাক্যগুলি হইতেই ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তিনি যেমন একদিকে পরম-তত্ত্বকে অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় বলিয়া নৈয়ায়িকগণের তর্কনিষ্ঠার প্রতি কটাক্ষ করিয়াছেন, তেমনই আবার অন্যদিকে স্বমত গঠন ও পরমত খণ্ডন করিবার জন্য বহু স্থলেই অচিন্ত্য-তত্ত্বের সুচিন্তিত বিশ্লেষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। বেদান্ত শ্রুতিপ্রধান হইলে তাহাতে তর্ক-যুক্তির স্থান অপ্রধান হওয়াই সঙ্গত, সুতরাং যাঁহারা তর্কযুক্তি প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণের প্রামাণ্য অস্বীকার করা কিংবা অচিন্ত্যবস্তুকে আশ্রয় করিয়া দর্শনশাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা অসঙ্গত বিবেচনা করেন, তাঁহারা ভারতের অদ্বৈতবাদকে যে পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যযুগের দার্শনিক প্রচেষ্টার সহিতই তুলনা করিবেন তাহা খুবই স্বাভাবিক। মধ্যযুগের চিন্তাপদ্ধতি পশ্চিমের বর্ত্তমানযুগের দার্শনিকগণ শাস্ত্রশৃঙ্খলপীড়িত বলিয়া অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে

অনুকরণীয় বিবেচনা করেন না। তাঁহারা বলেন যে, মানুষের আত্মা যেদিন হইতে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে, সেইদিন হইতেই মানুষ আত্মপ্রত্যয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বিজ্ঞান, দর্শন, প্রভৃতি বিবিধ ক্ষেত্রে নব নব তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। কেবলমাত্র শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মানুষের স্বভাবজাত সত্তা-আবিষ্কার ও জ্ঞানানুশীলনের শক্তি অবরুদ্ধ করা ও অন্ধ-বিশ্বাসে শাস্ত্রবাণীর চরমপ্রামাণ্য মানিয়া লওয়া নিতান্তই অনুচিত। এক কথায় বলিতে গেলে. শাস্ত্রের চরম প্রামাণ্য অস্বীকার করাই নবযুগের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং নবমন্ত্রে দীক্ষিত পাশ্চাত্য সমালোচক শ্রুতিপ্রধান অদ্বৈতবাদের বহুস্থানে দর্শনের জটিলসমস্যার সমাধানের পরিবর্ত্তে শাস্ত্রবাণীর আশ্রয় লওয়া বিশেষ শ্লাঘনীয় মনে করেন না। এই জন্য নবভাবাপন্ন ভারতীয় দার্শনিকগণের পক্ষে প্রমাণ সমুচ্চয়ে শ্রুতির স্থান নির্দ্দেশ করা একটি সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন আচার্য্যগণ কতকগুলি বিষয়ে লৌকিক প্রমাণের অযোগ্যতা স্বীকার করিয়া অলৌকিক প্রত্যক্ষেরই একমাত্র প্রামাণ্য মানিয়া লইয়াছিলেন। এমন কি, শঙ্করাচার্য্যও প্রথমে যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্ত কেবল মাত্র তর্কনৈপুণ্যের তারতম্যের উপর নির্ভর করে বলিয়া সাধারণভাবে তর্কের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া অবশেষে কোন কোন বিষয়ে তর্কের অবিসংবাদিত প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছিলেন এবং এই ভাবে অদ্বৈতদর্শনের চরমতত্ত্বই যে কেবল অলৌকিক প্রমাণগ্রাহ্য,

তাহাই সূচিত করিয়াছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সমালোচকের তীব্র কটাক্ষ আধুনিক ভারতীয় দার্শনিকগণকে বিশেষভাবে বিচলিত করিয়াছে বলিয়া মনে হয়; তাঁহারা অদ্বৈতবাদের চিরপ্রচলিত ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্যভাব-পুষ্ট এক খানি নূতন বার্ত্তিক প্রণয়ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই নূতন বার্ত্তিকের সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে ব্যাখ্যাপদ্ধতি বিষয়ে সাধারণভাবে দুই একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় মনে করি।

বিভিন্ন দেশের দর্শন চিন্তার ইতিহাসে দেখা যায় যে, অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন দার্শনিকগণ অন্যান্য দার্শনিকের মতন কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সমস্যার মধ্যেই নিজেদের দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়া সমসাময়িক বহুমুখী ভাবসম্পদ্‌গুলিকে লক্ষ্য করিয়াই তত্ত্বপ্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের চিন্তাসম্পদ বিভিন্ন মতের সংঘর্ষ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় বলিয়া কোন কোন স্থলে সাধারণ দৃষ্টিতে অসঙ্গতিদুষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। শঙ্করাচার্য্য, কাণ্ট, হেগেল প্রভৃতি দার্শনিকগণ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। কাণ্ট ও হেগেলের টীকা ও বার্ত্তিককারগণ মূল দার্শনিকের প্রকৃত বক্তব্য লইয়া অদ্যাবধি পরস্পর বিরুদ্ধ মত পোষণ করিয়া আসিতেছেন; এবং প্রত্যেকেই নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য মূলদর্শন হইতে প্রচুরভাবে বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হয় যে, কোন সমস্যাজটিল দার্শনিক মত বুঝিবার জন্য কেবল মাত্র কতকগুলি অসম্বদ্ধ

বাক্য উদ্ধৃত করিলেই টীকাকারের কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক-শ্রেণীর উদ্ধৃত বাক্যের সহিত অন্যশ্রেণীর বাক্যগুলির তুলনামূলক সমালোচনা করা না হয়, ততক্ষণ মূলদর্শনের প্রকৃত সিদ্ধান্ত নির্ণয় করা সুকঠিন। এ বিষয়ে আচার্য্যের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। বৃহদারণ্যক উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যে তিনি স্পষ্টভাবেই বলিযাছেন যে, শাস্ত্রের সকল বচনের নিশ্চিত প্রয়োগ সর্ব্বত্র পাওয়া যায় না; সুতরাং কোন বচনের প্রকৃতার্থ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিলে অন্যত্র তাহার নিশ্চিত প্রয়োগ দর্শন করিয়া অর্থ নির্দ্ধারণ করা উচিত। পাশ্চাত্য দার্শনিক কাণ্টও অনেকটা এইভাবেরই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যে অনেক সময় দেখা যায়, কোন এক দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃত সিদ্ধান্ত মূল দার্শনিক অপেক্ষা চিন্তাশীল টীকাকারই ভাল বুঝিতে পারেন, কারণ, মূল দার্শনিক সর্ব্বত্র নিশ্চিতার্থদ্যোতক বচন প্রয়োগ করেন না বলিয়া তাঁহার প্রকৃত মন্তব্য অপরিষ্কার ও দুর্ব্বোধ্যই থাকিয়া যায়। বিসংবাদী বাক্যগুলির তুলনামূলক সমালোচনা ব্যতীত অদ্বৈতবাদের ন্যায় জটিলদর্শনের সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের জন্য আর একটি উপায় এই যে, আচার্য্য যে সকল বিপক্ষ সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ ও খণ্ডন করিয়াছেন, তাহাদের সঙ্গে অদ্বৈতবাদের মূলগত পার্থক্য সুস্পষ্ট করিয়া প্রদর্শন। অনেক সময় বিপক্ষমত-খণ্ডন প্রসঙ্গে দার্শনিক যে সকল কথা বলিয়া থাকেন, তাহাতেই তাঁহার

গুহ্যার্থ স্ফুটতর হইয়া থাকে। এই দুই প্রকার সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের প্রণালী অনুসরণ করা বহু শ্রমসাধ্য, সন্দেহ নাই। ইহার তুলনায় বিপ্রকীর্ণ অসম্বদ্ধ বচন উদ্ধৃত করিয়া মূলদর্শনের ব্যাখ্যা করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। কিন্তু শেষোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিলে অপব্যাখ্যা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। বিশেষতঃ শাঙ্করবেদান্ত একটি নিতান্ত বহুমুখী ও জটিল দর্শন। ইহাতে শাস্ত্রদৃষ্টি ও যুক্তিদৃষ্টি, স্বাভাবিক দৃষ্টি ও পারমার্থিক দৃষ্টি অঙ্গাঙ্গিভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং আচার্য্য বহুস্থলেই দৃষ্টিনির্দ্দেশ না করিয়াই নিজের বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ফলে তাঁহার প্রকৃত সিদ্ধান্তনির্ণয় করা অতীব কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এস্থলে কেবলমাত্র শেষোক্ত প্রণালীর উপর নির্ভর না করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রণালীদ্বয় অনুসরণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

নূতন বার্ত্তিকটি যে অদ্বৈতবাদের একটী পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবচন গ্রন্থ হইতে পারে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যে সকল বর্ত্তমান পণ্ডিত অদ্বৈতবাদের পুরাতন চিরপ্রচলিত ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া নূতন বার্ত্তিক প্রণয়নের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা যে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের নিকট শাঙ্করবেদান্তের গৌরব বৃদ্ধি করিবেন তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রতীচীর যেগুলি যুক্তিপ্রধান দর্শন তাহাদিগের মূল সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে শ্রুতিপ্রধান অদ্বৈতবাদের মূল সিদ্ধান্তের সৌসাদৃশ্য থাকা কি

সম্ভব? পরমার্থতত্ত্ব বিষয়ে নিরপেক্ষ তর্কযুক্তি প্রভৃতি লৌকিক প্রমাণ নিতান্তই অপ্রমাণ। অনেক সময় বিপক্ষমত খণ্ডনপ্রসঙ্গে লৌকিক প্রমাণেরই আশ্রয় গ্রহণ অনিবার্য্য হইলেও পরমার্থ তত্ত্ব যে যুক্তি চাতুর্য্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেই পারে না এই কথাটি আচার্য্যের অদ্বৈতবাদের নেমিস্বরূপ। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি অনেক স্থলেই নব্য বার্ত্তিককারগণ বিস্মৃত হইয়া আচার্য্যের যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্তকেই প্রধান স্থান দিয়াছেন। ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ এই তিনটী বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ বিষয়ে আচার্য্যের সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিতে গিয়া কেহ কেহ বলিয়াছেন যে, যেমন প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ অন্য বস্তু ও বিষয়ের সম্পর্কে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে, সেইপ্রকার ব্রহ্মপ্রাপ্তির অবস্থাতে জীবের স্বরূপের একান্ত বিলুপ্তি না হইয়া সত্ত্বপ্রধান দেহেন্দ্রিয়াদিযোগে তাহার পূর্ণাভিব্যক্তিই হইয়া থাকে। আবার কেহ বলিয়াছেন যে, স্মৃতি, ইচ্ছা, প্রযত্ন প্রভৃতির সমষ্টিই জীবাত্মা. প্রত্যেক জীবাত্মার মধ্যে একটি বিষয়ী ও একটি বিষয় অঙ্গাঙ্গিভাবে অনুপ্রবিষ্ট আছে। একটি সাক্ষী চৈতন্য ও অন্যটি বিষয়-চৈতন্য। এই সাক্ষী-চৈতন্য বিষয়জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত হইয়া থাকে, কিন্তু বিষয়জ্ঞান তাহার কারণ নয়, অপিচ সাক্ষী-চৈতন্যের অভাবে কোন প্রকার বিষয়জ্ঞানই সম্ভবপর নয়। অন্তঃকরণ যখন চৈতন্য প্রবিষ্ট হইয়া তাহার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ হয়, তখন তাহাকে জীব আখ্যা দেওয়া হয়। এই জীবাত্মাতে অণুত্ব নাই, পরন্তু ইহা একটি অতীব জটিল বস্তু। দেহেন্দ্রিয়াদি জীবাত্মা দ্বারা

অনুভূত হইয়া জীবাত্মাতে একপ্রকারের একত্ব ও নিরবচ্ছিন্নতা প্রতিভাত করিয়া থাকে। জীবাত্মা পরিচ্ছিন্ন চৈতন্য মাত্র. এবং দেহেন্দ্রিয়াদির মতন বিকারশীল। কিন্তু পরমাত্মা অবিকারী ও সুখ-দুঃখাদি উপপ্লববিহীন। এই প্রকার জগৎ সম্বন্ধেও আচার্য্যের অভিমত ব্যাখ্যা করিতে গিয়া তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম একমাত্র সদ্‌বস্তু। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্যান্য বস্তু সর্ব্বৈব মিথ্যা— শাঙ্করবেদান্ত সম্বন্ধে এই যে প্রচলিত মত, এটা অপব্যাখ্যা মাত্র; আচার্য্য মৃগতৃষ্ণিকা ইন্দ্রজাল বিদ্যা প্রভৃতি কতকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়া নিজমত ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার ভাষ্যগুলি অবহিত চিত্তে সমালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি পারমার্থিক ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক এই তিন প্রকার সত্তার প্রভেদ কখনই অস্বীকার করেন নাই এবং এই জগৎ ও জগতের বিকারগুলিকে উড়াইয়া দেন নাই। তাঁহার প্রকৃত অর্থ এই যে জগতের কোন বস্তুই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহে। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু এই সকল গুণ ধর্ম্ম-বিকারাদির মধ্যেও ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান রহিয়াছে। কেহ কেহ আবার এই সিদ্ধান্তটিকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। শঙ্করের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রহ্ম জগতের অধিষ্ঠান। ভ্রমজ্ঞানে সর্প অসৎ হইতে উদ্ভূত হয় না, এবং ভ্রম অপনোদন হইলে সর্প অসতে বিলীন হয় না, মৃগতৃষ্ণিকার অনুভূতি স্থলেও সত্য অধিষ্ঠান প্রয়োজন হয়। সেই প্রকার জগৎপ্রপঞ্চ যে একটি স্বতন্ত্র বস্তু নয়, পরন্তু ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত,

এইটিই আচার্য্যের প্রকৃত অর্থ। তিনি জগৎপ্রপঞ্চ যে সত্য, তাহা অস্বীকার করেন নাই।

যখন মিথ্যাজ্ঞান নষ্ট হয়, তখন জগৎ-প্রপঞ্চ বিলয় প্রাপ্ত হয় না (not negated)। পরন্তু নিজরূপে প্রতিভাত হয় (transfigured, reinterpreted)। ব্রহ্ম জগতে বিদ্যমান রহিয়াছেন কিন্তু তিনি জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু, এইটিই আচার্য্যের অভিপ্রেত অর্থ। সেই প্রকার জীবও অসৎ নয়; জীব অসৎ হইলে জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির সাধনা করিতে উপদেশ দেওয়া এবং জীবন্মুক্তি, ক্রমমুক্তির প্রসঙ্গাদি নিতান্তই নিরর্থক হয়। মুক্ত অবস্থাতে জীব, মিথ্যা রূপ পরিত্যাগ করিয়া স্বরূপে প্রতিভাত হয়।

নূতন বার্ত্তিকের আরও কতকগুলি বিশেষত্ব আছে। সেগুলি এখানে যথাযথভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আর যে দুই একটি সিদ্ধান্তের সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিলাম, তাহাদের প্রকৃষ্টভাবে সমালোচনা করাও এই স্বল্পায়তন প্রবন্ধের মধ্যে অসম্ভব। বিশেষতঃ, যে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া আচার্য্যের স্বম্প্রদায়ভুক্ত মহামনীষী বৈদান্তিকগণও কোন কোন বিষয়ে বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করিয়া নববার্ত্তিকের সমালোচনা করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা-মাত্র। তবে অদ্বৈতবাদের কতকগুলি বিশিষ্টসিদ্ধান্ত বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের মতভেদ নাই। এই বিশিষ্টতা লক্ষ্য করিয়া নববার্ত্তিক সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা যাইতে পারে।

আচার্য্যের ব্যবহৃত অবিদ্যা, অসৎ প্রভৃতি শব্দগুলির প্রকৃতার্থ নির্ণয় করাই বর্ত্তমান বার্ত্তিকের প্রধান লক্ষ্য। বেদান্ত-ভাষ্যের ভূমিকাতে বলা হইয়াছে যে, বিষয় ও বিষয়ী, আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় নিতান্ত বিরুদ্ধ-স্বভাব; সুতরাং চিদাত্মক বিষয়ীতে যেমন বিষয়ের ও বিষয়ধর্ম্মের অধ্যাস মিথ্যা, তেমনই বিষয়ে বিষয়ীর ও বিষয়ীধর্ম্মের অধ্যাসও মিথ্যা। তথাপি মানুষ মিথ্যাজ্ঞানের প্রভাবে এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে পরস্পরের উপর অধ্যারোপিত করিয়া, ও সত্য মিথ্যাকে এইভাবে সংযুক্ত করিয়া 'আমি ইহা', 'ইহা আমার' এই প্রকার ব্যবহার চিরকালই করিয়া আসিতেছে। এই অধ্যাসকে পণ্ডিতগণ অবিদ্যা আখ্যা দিয়া থাকেন। এবং এই পরস্পর অধ্যস্ত বস্তুদ্বয়কে পৃথক করিয়া তাহাদের স্বরূপ অবধারণ করাই 'বিদ্যা' নামে খ্যাত। কিন্তু এই প্রকার অধ্যাস ব্যতীত প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার ও বিধিপ্রতিষেধ-মোক্ষ সম্বন্ধায় শাস্ত্র নিরর্থক হয়। এমন কি দেহ-ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে আত্মা বলিয়া ভ্রম না করিলে অসঙ্গ আত্মা প্রমাণকর্ত্তা হইতে পারেন না, আর প্রমাণকর্ত্তা ব্যতীত প্রমাণ-প্রবৃত্তিও থাকিতে পারে না। এই সকল অনর্থের মূল অধ্যাসকে নির্ম্মূল করিবার জন্যই বেদান্তের অবতারণা। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, একদিকে আচার্য্য যেমন অধ্যাসকে প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহারের জন্য অপরিহার্য্য বলিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনই আত্মার একত্ব উপপাদনের জন্য অধ্যাসকে পরিহার্য্যও বলিয়াছেন। এইটিই শাঙ্করবেদান্তের বৈশিষ্ট্য। একটি বস্তুকে

অন্য বস্তু বলিয়া ভুল করা, বা এক বস্তুর ধর্ম্ম অন্য বস্তুতে আরোপ করা যে নিতান্তই স্বাভাবিক, তাহা অন্যান্য সম্প্রদায়-ভুক্ত দার্শনিকগণও স্বীকার করিয়াছেন। দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতিকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা করা যে মিথ্যাজ্ঞান, তাহা ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রও প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছে। আর অধ্যাস যদি কেবল এই মিথ্যা আরোপ অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাতে শাঙ্করবেদান্তের বৈশিষ্ট্য কিছুই নাই। অধিকন্তু, আচার্য্য কেবল এই অর্থেই অধ্যাস শব্দ ব্যবহার করিলে দ্বৈতবাদ অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে; কারণ, দুইটি পদার্থ স্বীকার না করিলে অধ্যাস হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং, স্বমতের বৈশিষ্ট্য দেখাইবার জন্য ঐ ভূমিকাতে একথাও বলা হইয়াছে যে, অপ্রত্যক্ষ আকাশেও তলমলিনতার অধ্যাস হইয়া থাকে। অর্থাৎ দুইটি বস্তু প্রত্যক্ষ না হইলেই যে অধ্যাস হইতে পারে না, তাহা সর্ব্বত্র সত্য নয়— এই বলিয়া আচার্য্য নিজসিদ্ধান্তের সূচনা করিয়াছেন।

নুতন ব্যক্তিকে আচার্য্যের অধ্যাসবাদের এই বৈশিষ্ট্যটির প্রতি আদৌ লক্ষ্য করা হয় নাই। তাঁহারা বলেন যে, বিষয়-ইন্দ্রিয় যোগে আত্মাতে যে সকল গুণ, ধর্ম্ম বা বিকারের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে সেগুলি আত্মার জ্ঞেয় বস্তু; আত্মার স্বরূপ এই গুণধর্ম্ম বিকারের মধ্যেও স্বতন্ত্র ও অবিকৃত থাকে এবং এই জন্যই আত্মা জ্ঞাতা। কিন্তু এই সকল অভিব্যক্ত বস্তুগুলিকে আত্মার উপরে অধ্যারোপিত করিয়া যদি আত্মাকে

বিকার-সমষ্টি বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে এই ভ্রান্ত ধারণার নামই অবিদ্যা। অবশ্য অবিদ্যার এই অর্থ নব্যটীকাকারগণের স্বকপোলকল্পিত নয়। আচার্য্যের সুস্পষ্ট বচন উদ্ধৃত করিয়া ইহার সমর্থন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য, যে আচার্য্য অন্যত্র অবিদ্যা সম্বন্ধে যে সকল উক্তি করিয়াছেন, তাহা হইতে অবিদ্যার এই অর্থ নিষ্কাসিত করা নিতান্তই অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণের ভাষ্য হইতে দুই একটি সুস্পষ্ট বাক্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। প্রথমে দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব উপপাদন করিয়া, কর্ম্মবশতঃ তাঁহারই বন্ধন হয়—ইহা স্বীকার করিলে কহোলের প্রশ্ন দুরতিক্রম্য হইয়া উঠিল. যে ব্রহ্মস্বরূপ আত্মার স্বরূপ, বলিয়া জ্ঞান হইলেই জীব বন্ধনমুক্ত হয় সে স্বরূপটি কি? উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অশনয়া পিপাসা প্রভৃতি সাংসারিক ধর্ম্ম যাঁহাতে নাই—তিনিই আত্মা! এখানে প্রশ্ন হইতে পারে এক আত্মাতে সাংসারিকত্ব ও অসাংসারিকত্ব এই দুইটি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের সমাবেশ কি প্রকারে হইতে পারে? ইহার উত্তরে আচার্য্য বলিলেন,—আত্মার এই সকল ধর্ম্ম নাম-রূপ-বিকার কার্য্যকারণ লক্ষণাদি উপাধিসম্পর্কজনিত ভ্রান্তিমাত্র, যেমন গগণে মালিন্য, রজ্জুতে সর্পত্ব, শুক্তিকাতে রজতত্ব প্রভৃতি অধ্যস্ত হইলেও রজ্জু, শুক্তিকা, গগণ প্রভৃতির স্বরূপ বিকৃত হয় না, তেমনই এই স্থলেও সাংসারিক ধর্ম্ম কেবল অধ্যস্ত ধর্ম্ম মাত্র, ইহা দ্বারা আত্মার স্বরূপ বিকৃত হয় না। কিন্তু এই উত্তরে আর

একটি অপরিহার্য্য প্রশ্ন উত্থাপিত হইল—তুইটি পদার্থ ভিন্ন অধ্যাস হওয়া অসম্ভব, তবে কি ব্রহ্ম ব্যতীত নামরূপাদি বলিয়া পদার্থ সত্যই জগতে আছে ? যদি থাকে, তাহা হইলে একমেবা-দ্বিতীয়ং নেহনানাস্তি কিঞ্চন ইত্যাদি শ্রুতিবচনের অর্থ কি ? এই চরম প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্যের চরম সিদ্ধান্ত এই যে, নামরূপাদি উপাধি পরমার্থ-দৃষ্টিতে আত্মা হইতে পৃথক না হইলেও পৃথকরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। অর্থাৎ অজ্ঞান দশাতে ভেদবুদ্ধি থাকে বলিয়া অধ্যাস সম্ভব হয়; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান হইলে ভেদবুদ্ধিও থাকে না, আর সেইজন্য অধ্যাস হওয়াও সম্ভব হয় না। এই চরমসিদ্ধান্তটি অজ্ঞান-বোধিনীতে আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। শিষ্য গুরুকে বলিলেন—স্বামিন্! আপনার বাক্য সামঞ্জস্য-বর্জ্জিত বলিয়া বোধ হইতেছে, কূটস্থ চিদ্‌ঘন আত্মার শশশৃঙ্গ-সদৃশ অবিদ্যাদ্বারা আবরণ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? অসৎ আকাশ-কুসুমের কি সৌরভ থাকা সম্ভব ? শিষ্যের এই প্রশ্নের উত্তরে গুরু পরম প্রীত হইলেন। অবিদ্যাকে শশশৃঙ্গ ও গগণ-কমলিনীর সঙ্গে তুলনা করিতে দেখিয়া তিনি কিছুমাত্র অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন না; বরং শিষ্যবাক্যের সমর্থন করিয়াই তিনি উত্তর দিলেন—সাধু বৎস, সাধু, এই আবরণ বিক্ষেপাদিও তো কেবল ভ্রমমাত্র। তাহার পর শিষ্য অনুসন্ধিৎসু হইয়া যখন পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—ভ্রমকল্পিত বস্তু কি কখন সত্য হইতে পারে ? তখন এই উত্তর দিয়া গুরু শিষ্যকে শান্ত করিলেন যে, ইন্দ্রজাল ক্রিয়া দর্শনকালে যে প্রকার নিতান্ত

অসৎ বস্তুও সত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়, কিন্তু ভ্রম নিবৃত্ত হইলে বুঝিতে পারা যায় যে ঐন্দ্রজালিক বস্তুগুলি সমস্তই মিথ্যা, সেই প্রকার অবিবেকভ্রম নিবৃত্ত হইলে, আবরণ বিক্ষেপাদি সমস্তই যে নিতান্তই অলীক, তাহা সুস্পষ্ট হইয়া থাকে।

এই প্রকারে অবিদ্যাকে শশশৃঙ্গ খপুষ্প প্রভৃতি অলীক পদার্থের সহিত তুলনা করা মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যেও প্রচুর পরিমানে দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইহাও সত্য, যে তিনি অনেক স্থানে ত্রিবিধ সত্ত্বা স্বীকার করিয়াছেন।পারমার্থিক সত্ত্বা, ব্যবহারিক সত্ত্বা ও প্রাতিভাসিক সত্ত্বা এই তিনটি যে এক বস্তু নয়, তাহাও তাঁহার অভিমত। বিশেষতঃ, ব্যবহারিক সত্ত্বার সত্যত্ব প্রমাণ করিতেই তিনি বৌদ্ধসম্মত বিজ্ঞানবাদ শূন্যবাদাদি খণ্ডনও করিয়াছেন। কিন্তু ইহাও সত্য যে, পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্যবহারিক সত্ত্বা ও প্রাতিভাসিক সত্ত্বা এই দুইই মিথ্যা। অর্থাৎ লৌকিক দৃষ্টিতে যেমন প্রাতিভাসিক সত্ত্বা মিথ্যা, পারমার্থিক দৃষ্টিতে সেই প্রকার ব্যবহারিক সত্ত্বাও মিথ্যা—এইটিই আচার্য্যের চরমসিদ্ধান্ত। সুতরাং যাঁহারা আচার্য্যসম্মত জগতের সত্ত্বাকে প্রাতিভাসিক সত্ত্বার সহিত তুলনা করিয়া জাগতিক বস্তুগুলিকে illusion বলেন, তাঁহাদের অভিমত যেমন গ্রহণীয় হইতে পারে না, পক্ষান্তরে তেমনই যাঁহারা ব্যবহারিক সত্ত্বা ও প্রাতিভাসিক সত্ত্বার ভেদকে অবিনাশী ভেদ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহাদের অভিমতও আচার্য্যের চরমসিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না। অদ্বৈতবাদ-সম্মত পারমার্থিক অবস্থাতে ভেদ-বুদ্ধি আদৌ থাকে

না, এ কথাটি ভুলিলে চলিবে না। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, প্রমাণ-প্রমেয় অভিব্যক্ত-অভিব্যক্তি, ধর্ম্ম-ধর্ম্মী প্রভৃতি যে সকল ভেদবুদ্ধি ব্যবহারিক অবস্থাতে অপরিহার্য্য, পারমার্থিক অবস্থাতে সে সকলেরই পরিহার হয়; তখন এক সৎস্বরূপ, বিশুদ্ধ চিদ্‌ঘন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। এ বিষয়ে বিবেক-চূড়ামণি ও তত্ত্বোপদেশ হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।—

সদিদং পরমাদ্বৈতংতস্মাদন্যস্য বস্তুনোভাবাৎ
নহ্যন্যদস্তি কিঞ্চিৎ সম্যক্ পরমার্থতত্ত্ববোধদশায়াম্।

—বিবেক-চূড়ামণি—

বস্তুতো নিস্প্রপঞ্চোসি নিত্যমুক্তঃ স্বভাবতঃ
ন তে বন্ধবিমোক্ষৌ স্তঃ কল্পিতৌ তৌযতস্ত্বয়ি।
ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ
ন মুমুক্ষুর্ন বৈমুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা।—তত্ত্বোপদেশ—

ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আচার্য্যের ভাষ্যে বহুস্থলে দ্বৈতব্যঞ্জক সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার প্রয়াস থাকিলেও তাহাকে চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা উচিত নয়। কোন কোন স্থানে ব্যবহারিক দৃষ্টি ও পারমার্থিক দৃষ্টি-গ্রাহ্য সিদ্ধান্তের পার্থক্য তিনি নিজেই প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু কোন কোন স্থানে দৃষ্টি নির্দ্দেশ না করিয়াই সিদ্ধান্ত সমর্থনে সচেষ্ট হইয়াছেন। এরূপ স্থলে অন্যত্র নির্দ্দিষ্ট পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই

তাঁহার মন্তব্য ব্যাখ্যা করা উচিত, নতুবা বাক্যগুলি অসঙ্গতিদুষ্ট হইয়া পড়ে। যে সকল স্থানে কথোপকথন ও প্রশ্নোত্তর রূপে সূক্ষ্ম হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সেই সকল স্থানগুলির প্রতি মনোযোগ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, দ্বৈতব্যঞ্জক সিদ্ধান্তগুলি সোপানসমূহের মতন পরমার্থতত্ত্ব বিজ্ঞাপনে সাহায্যকারী উপায় মাত্র। ঐ চরমসিদ্ধান্ত সুপ্রকটিত করিবার জন্য যে সকল অবান্তর সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনের সিদ্ধান্তসমূহের বহুস্থলে সৌসাদৃশ্য ও একতা আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু অবান্তর সিদ্ধান্তকে চরমসিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদ বিসংবাদী বাক্যসমূহের একটি অবোধ্য ও সুজটিল তালিকাতেই পর্য্যবসিত হইবে। লৌকিক প্রমাণের অবিষয়ীভূত সর্ব্ব-উপাধি বিনির্ম্মুক্ত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে দ্বৈতদুষ্ট লৌকিক প্রমাণ দ্বারা প্রকটিত করিতে হইলে কতকগুলি কল্পিত রূপের প্রয়োজন হইয়া থাকে। আচার্য্যও সেই জন্যই অনেক স্থানে কল্পিতরূপকে আশ্রয় করিয়া মুখ্য প্রতিপাদ্য বস্তুর পরোক্ষভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে অর্থবাদ, উপপত্তি প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত তাৎপর্য্যনির্ণয়-পদ্ধতিগুলি স্মরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই জন্যই অদ্বৈতবাদ ব্যাখ্যানে কেবলমাত্র আচার্য্যের বচন উদ্ধৃত করিলে অপব্যাখ্যা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

অদ্বৈতদর্শনের স্বরূপনির্দ্দেশ করার দ্বিতীয় উপায় বিপক্ষ-সিদ্ধান্ত। আচার্য্য কেবলমাত্র বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল

বৌদ্ধমতাদি খণ্ডন করিয়াই নিরস্ত হন নাই। সমসাময়িক ও পূর্ব্বকালবর্ত্তী বৈদান্তিক সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ করিয়া নিজ সিদ্ধান্তের সহিত তাহাদের যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, তাহা দেখাইয়াছেন। এমন কি, পরবর্ত্তীকালে রামানুজ, নিম্বার্ক, শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈদান্তিক মহামনীষিগণ যে সকল সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার সুস্পষ্ট সঙ্কেত ঔড়ুলোমি, আশ্মরথ্য, কার্ষ্ণাজিনি প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণের অভিমত সিদ্ধান্তে পাওয়া যায়। এবং আচার্য্য এই সিদ্ধান্তগুলির উল্লেখ করিয়া, অভিব্যক্তিবাদ, সত্যভেদবাদ, ভেদাভেদবাদ যে তাঁহার বিপক্ষসিদ্ধান্ত মাত্র তাহা স্পষ্টাক্ষরেই বলিয়া দিয়াছেন। ইহা হইতেও স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই সকল বৈদান্তিক সিদ্ধান্তগুলিকেও তিনি দ্বৈতদুষ্ট বলিয়াই বিবেচনা করিয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অনির্ব্বচনীয় বস্তুর নির্ব্বচন অচিন্ত্য সত্তার সুচিন্তন, সর্ব্ববিশেষশূন্য অবাঙ্‌মনসগোচর বস্তুর মনন—ইহাই ভারতীয় অদ্বৈতবাদের বৈশিষ্ট্য। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রকার প্রচেষ্টা নিতান্তই অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়! পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসেও দেখা যায় যে, কাণ্ট, হামিল্টন, ম্যানসেল, হার্বার্ট্‌স্পেন্‌সার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অচিন্ত্যসত্তার নির্ব্বচন অসম্ভব বলিয়াছেন; কিন্তু তাহাকে অসৎ বলেন নাই। অন্য পক্ষে প্রতীচীর সুপ্রসিদ্ধ মনীষী হেগেল ও তাঁহার সম্প্রদায়-ভুক্ত দার্শনিকগণ অচিন্ত্যসত্তাকে নিতান্তই অসৎ বলিয়া

পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং, তাঁহাদের সিদ্ধান্তের সহিত ভারতীয় অদ্বৈতবাদের প্রাণের সংযোগ থাকিতে পারে না। ভারতের তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ যেভাবে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নয় বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, কতকটা সেইপ্রকারেই হেগেল ও তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত দার্শনিকগণও নিরূপাখ্য নির্ব্বিশেষ সন্মাত্র বস্তুকে অসৎ বলিয়াই পরিহার করিয়াছেন। যে বস্তুর নির্ব্বচন নিতান্তই অসম্ভব, তাহার সঙ্গে অসতের ব্যবধান কিছুই নাই, তাহা অর্থহীন বাক্যমাত্র, এই সিদ্ধান্তই তাঁহারা নানা ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। এই পূর্ব্বপক্ষ আপাত-দৃষ্টিতে অনতিক্রম্য বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও আচার্য্য তাহার সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের দ্বাদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মকে সৎ বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যেমন অসম্ভব, তেমনই অসৎ বলিয়াও নির্দ্দেশ করাও অসম্ভব। আচার্য্য ভাষ্যে বলিলেন, জাতি, গুণ, ক্রিয়া বা সম্বন্ধ যে বস্তুতে নাই, সেই নির্গুণ নিষ্ক্রিয় অদ্বয় বস্তু কোন শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব, এইজন্য শ্রুতিতে 'যতো বাচোনিবর্ত্তন্তে' ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। এই বলিয়া আচার্য্য আবার এয়োদশ শ্লোকের ভাষ্যে বলিলেন, যে বস্তুকে সৎ বলিয়াও নির্দ্দেশ করা যায় না তাহা তো নিতান্তই অসৎ এই আশঙ্কা হইতে পারে, সুতরাং ব্রহ্মকে সর্ব্বপাণিপাদ-বিশিষ্ট বলিয়াই নির্দ্দেশ করা উচিত, তিনি পাণিপাদাদিতে অনুস্যূতভাবে অবস্থিতি করিয়া তাহাদিগকে

আপনাপন ক্রিয়া করাইতেছেন—এই প্রকার অধ্যারোপ-পদ্ধতি দ্বারা ব্রহ্মে জ্ঞেয়ধর্ম্ম পরিকল্পনা করিয়া নিষ্প্রপঞ্চের প্রপঞ্চন অতীব প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ অচিন্ত্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে তটস্থ লক্ষণ দ্বারা বুদ্ধিগ্রাহ্য করা নিতান্ত দরকার। সচ্চিদানন্দই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ, কিন্তু ভেদ ব্যতীত কিছুই আমাদের বুদ্ধি-গ্রাহ্য হওয়া অসম্ভব। অন্ততঃ তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বা বিশেষ্য-বিশেষণ সম্বন্ধ ব্যতীত কোন বস্তুই বুদ্ধ্যারূঢ় হইতে পারে না। কিন্তু সচ্চিদানন্দ তো ব্রহ্মের বিশেষণ নয়, সুতরাং এ স্থলে তাদাত্ম্যের অধ্যাস অপরিহার্য্য। যে পর্য্যন্ত পারমার্থিক দৃষ্টি না হয়—ততদিন তটস্থ লক্ষণই নিষ্প্রপঞ্চ বস্তুর প্রপঞ্চনের একমাত্র উপায়, এবং শাস্ত্রই তত্ত্বজিজ্ঞাসুর একমাত্র সম্বল। এই জন্যই অদ্বৈতসাধনে মননকে বহিরঙ্গ-সাধনা বলা হইয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্ম মননজনিত বিজ্ঞানের বিষয় নয় জানিয়াও সাধনার অঙ্গরূপে বিপক্ষ সিদ্ধান্ত নিরাকরণের জন্য ব্রহ্মের মনন করিতে বৈদান্তিকগণ উপদেশ দিয়াছেন।

বৃত্ত্যাত্মক লৌকিক জ্ঞানের দ্বারা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম পরিজ্ঞাত হইতে পারে না। তথাপি মনন দ্বারা তাঁহার ঔপাধিক রূপ অনুচিন্তন সাধনার অঙ্গ হিসাবে অতীব প্রয়োজনীয়,—এই সত্যটি প্রদর্শন করিয়া আচার্য্য যুক্তিবাদ (rationalism) ও অনুভূতিবাদ (mysticism) এই দুইটির যে অপূর্ব্ব সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা ভারতীয় অদ্বৈতবাদের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ। ভারতের চিন্ময় ভাণ্ডারের

এই বহুমূল্য রত্নটির প্রকৃত পরিচয় বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর কাছে না দিয়া কেবলমাত্র প্রতীচীর নিত্য পরিবর্ত্তনশীল যুক্তিলব্ধ সিদ্ধান্ত ও প্রমাণপদ্ধতির সহিত অদ্বৈতবাদের সৌসাদৃশ্য প্রদর্শন করিলেই বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় দার্শনিকের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য শেষ হইবে কি না, এই কথাটি চিন্তা করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে।

দর্শনশাস্ত্র ও যুগসমস্যা।

বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল মনীষিগণ মানুষের চিরন্তন সমস্যাগুলির কি ভাবে সমাধান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার সমালোচনা দ্বারা সত্যবস্তুটিকে ধরিবার প্রয়াস, এবং পাশ্চাত্যদেশে আজও যে সমস্যার সিদ্ধান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না, ভারতীয় দর্শনে তাহার সমাধান হইয়াছে কি না, তাহার অনুসন্ধান, আধুনিক দার্শনিকের একটি পরম কর্ত্তব্য। কিন্তু অনেকেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—যে সময় একদিকে অশিক্ষিত নিরন্ন, অর্দ্ধনগ্ন কুটীরবাসী দারিদ্র্যের চরমসীমায় উপস্থিত, অন্যদিকে শিক্ষিত যুবকবৃন্দ সংসারাশ্রমের প্রবেশদ্বারে জীবিকার্জ্জনের পথ অবরুদ্ধপ্রায় দেখিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়; যেকালে একদিকে জাতিসংঘ ও অস্ত্রনিয়ন্ত্রণ-সমিতি রক্তপিপাসু জাতিকে সংযত করিবার জন্য ব্যস্ত, আর অন্যদিকে সুসভ্য বলদৃপ্ত জাতি স্বার্থসিদ্ধির জন্য দুর্ব্বলপীড়নে বদ্ধপরিকর; যখন একদিকে শাসনসংস্কার লইয়া রাজাপ্রজা ও অন্যদিকে আপন আপন অধিকার লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় ব্যাকুল—এই ভাবে যে যুগে মানুষের দৈনন্দিন জীবনই সমস্যাসঙ্কুল হইয়া উঠিয়াছে, সে যুগেও কি দার্শনিকগণ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, আত্মা প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের কাল্পনিক সমস্যা লইয়া জীবন কাটাইলে তাহাকে সার্থকজীবন বলিয়া গণ্য করিতে হইবে?

জীবন-সংগ্রামের যে কোলাহল এতদিন প্রধানতঃ সমুদ্রের পরপারেই সীমাবদ্ধ ছিল, আজ তাহা ভারতবর্ষের আকাশবাতাস পূর্ণ করিয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুস্থান প্রাচীন ভারতের মত বিশ্ব-লীলাকে উপেক্ষা করিয়া বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে না। কারণ, আজ জগতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি পরস্পরের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্বদ্ধ হইয়া এক বিরাট্‌দেহের অংশরূপে পরিণত হইয়াছে। এখন এক জাতির সমস্যা অন্যান্য জাতির সমস্যা হইতে পৃথক করা যায় না; এখন একের মঙ্গলে অন্যের মঙ্গল, এবং জগতের সুদূরপ্রান্তে কোন অমঙ্গলের সূচনা হইলে তাহার প্রতিক্রিয়া দেহানুপ্রবিষ্ট বিষের মত বিশ্বের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। এই নিবিড় আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধের আভাস গত মহাসমরের সময় আমরা বিশেষভাবেই অনুভব করিয়াছি। সেইজন্য আজ প্রাচীনপন্থী হিন্দুস্থান তাহার চিরন্তন আভিজাত্য পরিহার করিয়া বিশ্বসভায় আপনার স্থান পাইতে সচেষ্ট হইয়াছে। অস্পৃশ্যতানিবারণ, অসবর্ণবিবাহ, যৌনবিবাহ, জন্মনিরোধ, স্ত্রীস্বাধীনতা প্রভৃতি দেশব্যাপী আন্দোলন ঐ আন্তর্জ্জাতিক ঘনিষ্ঠতার অবশ্যম্ভাবী ফল। সামাজিক আচার-ব্যবহার, ধর্ম্মবিশ্বাস, নৈতিকবিধান, শিক্ষাপদ্ধতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই দেশহিতৈষী সংস্কারকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও অতুলনীয় স্বার্থত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। হিন্দুসভ্যতার এই সন্ধিক্ষণে দার্শনিক নির্লিপ্তভাবে আধুনিক ভারতের অপরিহার্য্য ঐহিক সমস্যাগুলির সমাধান না করিয়া পারত্রিক সমস্যা লইয়া

গবেষণা করিলে তাঁহার দ্বারা জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবার আশা কোথায় ?

এই প্রশ্নের উত্তরে দুই একটি কথা বলা আমার অভিভাষণের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমে দর্শনচিন্তা সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণা দূর করিলে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার সুবিধা হইবে। ইহা সত্য যে ব্রহ্ম, ঈশ্বর, পরকাল প্রভৃতি চরমপ্রশ্নের সমাধান করাই দর্শন শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই সকল প্রশ্ন দার্শনিকের কপোলকল্পিত নয়। আমরা যে সকল সমস্যা ও প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দৈনিক জীবনের কাজ নির্ব্বাহ করি, তাহার চরম অর্থ পরিস্ফুট করিবার প্রয়োজন সাধারণতঃ হয় না; সেইজন্যই সমস্যার অন্তর্ব্বর্ত্তী সমস্যা অপ্রকাশিত থাকিয়া যায়। এই প্রশ্নান্তর্ব্বর্ত্তী প্রশ্নগুলিকে বিশদ্‌ভাবে পরিস্ফুট করিলে তাহারাই অবশেষে চরম প্রশ্নে পরিণত হয়। সম্প্রতি বিহার বা কোয়েটাতে রুদ্রদেবের যে তাণ্ডবনৃত্য হইয়া গিয়াছে, তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে যদি কোন ধর্ম্মপ্রাণ সংস্কারক বলেন, "হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতারূপী পাপের সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য মঙ্গলনিলয় ভগবান্ এই ধ্বংসলীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন" —এই উত্তর যে অনুপ্রবিষ্ট প্রশ্নের উত্তর হইল না, তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। বিশ্বের প্রত্যেক কার্য্যের আদিকারণ ভগবান্ হইলে মানুষের আচরণের জন্য তিনি শাস্তি কি দিতে পারেন? যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার স্বকার্য্যের জন্য দায়ী হওয়া কি সম্ভব? এই প্রকার প্রশ্নপরম্পরায় ঈশ্বরতত্ত্ব,

জীবতত্ত্ব প্রভৃতি নানাবিধ দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব অনিবার্য্য হইয়া উঠে। সুতরাং কোন বিষয়ের সহিত সম্যগ্‌ভাবে পরিচয় অর্থাৎ তাহার প্রকৃতস্বরূপকে দর্শন করাই দর্শন চিন্তার উদ্দেশ্য। জগৎ, জীবাত্মা, পরমাত্মা, চৈতন্য, জড়, সমাজ নীতি, রাষ্ট্র প্রভৃতি যে কোন বিষয়ের তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের নামই দর্শন। এইজন্য দার্শনিককে তত্ত্বদর্শী বলা হয়।

উদ্দামকল্পনা-প্রসূত অসংযত চিন্তাপ্রবাহকে দার্শনিক চিন্তা বলা যাইতে পারে না। এমন কি, কল্পনা-কৌতুকী কবি ও ঔপন্যাসিক যাহা সৃষ্টি করেন, তাহাও সত্যপ্রেমিক দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা যাইতে পারে। কবি ও ঔপন্যাসিকের একমাত্র সম্বল কল্পনা-শক্তি, কিন্তু দার্শনিকের সম্বল সমীক্ষণ, সম্যগ্‌ দর্শন। অনেক সময় কবি ও দার্শনিক উভয়কেই স্রষ্টা বলা হয়। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে, চিত্তবিনোদন কবির মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহার সৃজনী শক্তি সত্যমিথ্যার ব্যবধান অতিক্রম করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অন্যপক্ষে তত্ত্বদর্শন দার্শনিকের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়াতে তাঁহার নিকট সদসতের গণ্ডী অনতিক্রমণীয়। সেইজন্য কবির সৃষ্টবস্তু অভিনব ও মধুময় হইতে পারে; কিন্তু যাহা সত্য, তাহা অপ্রকাশ থাকিলেও শাশ্বত, সনাতন; দার্শনিক এই অজ্ঞাতপূর্ব্ব চিরন্তন তত্ত্বকে অজ্ঞানের আবরণ হইতে মুক্ত করিয়া প্রকাশ করেন মাত্র।

পুরাতনের সহিত প্রথম পরিচয়কে সৃষ্টি বলা যাইতে পারে, এবং এই অর্থে দার্শনিকও স্রষ্টা।

যে তত্ত্বদর্শন দার্শনিকের চরম লক্ষ্য তাহার পথ বন্ধুর ও বিঘ্নসঙ্কুল। সেইজন্য আপাত-দৃষ্টিতে দার্শনিকের তীর্থযাত্রা তর্ককণ্টকিত নিস্ফল অভিযান বলিয়াই মনে হয় এবং তাঁহার সমীক্ষিত সিদ্ধান্ত সহজবুদ্ধির আকার বিকৃত করে বলিয়া দর্শন-সম্মত মীমাংসা অনেক সময় অসম্বদ্ধ প্রলাপের মত অদ্ভুত ও অমূলক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কিন্তু যে অভিযান সকল সময়ে সাফল্য মণ্ডিত হয় না, তাহা যদি নিরর্থক হইত আর যে সিদ্ধান্ত অদ্ভুত, তাহা যদি মিথ্যা হইত, তাহা হইলে যে বিজ্ঞান আধুনিক বহুমুখী সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ হইয়া মানুষের অশেষ কল্যাণের কারণ বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে, তাহার পরিপুষ্টির পথ বহুপূর্ব্বেই অবরুদ্ধ হইয়া যাইত। আজ যে সকল বিজ্ঞানসম্মত তথ্য জড়জগৎ সম্বন্ধে চরম সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, তাহা ইদানীন্তন অশিক্ষিতের নিকট যেমন উদ্ভট, পূর্ব্বজ শিক্ষিতের নিকটও তেমনি অদ্ভুত ছিল।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য। কেহ কেহ মনে করেন যে, যাঁহারা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা করেন তাঁহারা একটি পৃথক গোষ্ঠীভুক্ত জীববিশেষ, এবং তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালীর সহিত আমাদের হাসিকান্নাময় জীবনের কোনই সম্পর্ক নাই। এ প্রকার ধারণা কিন্তু নিতান্তই অমূলক। যদিও ইহা সত্য যে, তত্ত্বজিজ্ঞাসা যখন দৈনন্দিন জীবনের শাসন হইতে মুক্ত

হয়, অনুসন্ধিৎসার খরপ্রবাহ যখন সাধারণ জীবনের সীমান্ত-প্রদেশ অতিক্রম করিয়া যায়, তখনই সাধারণতঃ দর্শনচিন্তা আরম্ভ হয়; তথাপি চরমতত্ত্ব না জানিলেও মানুষ চিন্তাশীল ও তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলেই তাঁহাকে দার্শনিক বলা যাইতে পারে। এই অর্থে মানুষমাত্রেই দার্শনিক। আবেষ্টনের তত্ত্বসম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া কেহই বাঁচিতে পারে না। পিপাসুকে জলর এবং ক্ষুধার্ত্তকে খাদ্যের তত্ত্ব বাধ্য হইয়া জানিতে হয়। এইরূপে প্রকৃতির শাসনে প্রত্যেক মানুষকেই আংশিকভাবে তত্ত্বজ্ঞ বা দার্শনিক হইতে হয়। আংশিক জ্ঞান কিংবা খণ্ডদৃষ্টি লইয়া দার্শনিক তৃপ্ত হইতে পারেন না বলিয়া তিনি চরমতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গবেষণা করিয়া থাকেন।

এপর্য্যন্ত দর্শন ও দার্শনিকের লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহা হইতে বর্ত্তমান যুগের দার্শনিকের কর্ত্তব্যনির্ণয় কথঞ্চিৎ সুসাধ্য হইতে পারে। আজ গ্রামসংস্কার, সমাজ-সংস্কার, শিক্ষাসংস্কার, ধর্ম্মসংস্কার প্রভৃতি বহুবিধ দেশব্যাপী আন্দোলনে জাতীয় জীবন উৎক্ষিপ্ত। এতদিনে যেন ব্রহ্মার হিসাব-নিকাশের দিন উপস্থিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত তিনি সৃষ্টির আনন্দেই মগ্ন ছিলেন, সৃষ্টির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার অবকাশ ছিল না; আজ সেইজন্য প্রত্যেক সৃষ্টবস্তুর প্রকৃত মূল্য পরীক্ষা করিতে বসিয়াছেন। এই হিসাব-নিকাশের দিনে তত্ত্বপ্রেমিক দার্শনিকের কল্যাণতত্ত্ব নির্ণয় করা একটি

পরম কর্ত্তব্য। সুতরাং এই বিষয়ে দুই একটি কথা সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, প্রচলিত অনুষ্ঠান কল্যাণের পথ অবরুদ্ধ করিলেই সংস্কারের সার্থকতা। সুতরাং জাতীয় কল্যাণের প্রকৃত রূপ দর্শন করা প্রত্যেক কল্যাণকামী সংস্কারকের অবশ্যকর্ত্তব্য। কতকগুলি ইষ্টক ও প্রস্তরখণ্ড স্তূপীকৃত করিলেই গৃহনির্ম্মাণ হয় না। ইষ্টকপ্রস্তরাদি কোন একটি পদ্ধতি অনুসারে সুবিন্যস্ত করিলে তবেই তাহা প্রাসাদে পরিণত হয়। অবিন্যস্ত ইষ্টকস্তূপ ও প্রাসাদের মধ্যে এই যে প্রভেদ তাহা হইতে সংহতি ও সংযোগের মধ্যে মূলগত পার্থক্য বুঝিতে পারা যায়। স্তূপ হইতে একখানি ইষ্টক অপসারিত হইলে অন্য ইষ্টকের কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। সমষ্টিগত অবস্থাতে তাহার আকার, ওজন প্রভৃতি ব্যষ্টিধর্ম্ম যেমন ছিল, অসংযুক্ত অবস্থাতেও ঠিক তেমনই থাকিয়া যায়। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে ইষ্টকপ্রস্তরাদি প্রাসাদের অংশরূপে পরিণত হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাহাদের মধ্যে একটি নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। অট্টালিকার একটি ইট স্থানভ্রষ্ট হইলে কেবল যে অট্টালিকার অকল্যাণ হয়, তা নয়, পরন্তু ইটেরও আকার বিনষ্ট হইতে পারে। আর এই আকারবিকৃতি কি পরিমাণে হইবে, তাহা ইটের সমষ্টিগত স্থানের উচ্চতার উপরে নির্ভর করে। এই যে সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে ইতরেতর সম্বন্ধ, তাহা জীবদেহে আরও নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য কল্যাণতত্ত্ব বুঝিবার

জন্য জীবদেহ একটি প্রাঞ্জল দৃষ্টান্ত। ফুসফুস্, হৃদয়, প্লীহা, যকৃৎ প্রভৃতি দেহান্তর্গত যে সকল ক্রিয়াশীল অঙ্গ লইয়া আমাদের শরীর নির্ম্মিত, তাহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্রিয়া সম্পাদন করিলে তবেই শরীরের কল্যাণ। কিন্তু কোনও কারণে একটি অঙ্গ আপনার নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদনে অশক্ত কিংবা নিবৃত্ত হইলে শারীরিক অকল্যাণের সূত্রপাত হয়। আর এই অকল্যাণের প্রতিক্রিয়া সমস্ত শরীরে বিসর্পিত হয় বলিয়া ধর্ম্মবিচ্যুত অঙ্গও তাহার ফলভোগ করে। সঙ্ঘশক্তি যতই পরিণতি ও উৎকর্ষ লাভ করে, ততই ব্যষ্টির কল্যাণ পরস্পরের সহিত ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট হয়। সেইজন্য দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন একটি যন্ত্র দৈহিক অকল্যাণের জন্য দায়ী হইলে প্রতিধ্বনির মত তাহা উৎপত্তিস্থানে ফিরিয়া আসে।

এই খানেই সংহতি ও সংযোগের মধ্যে পার্থক্য। স্তূপের ইষ্টকপ্রস্তরাদির সম্বন্ধকে দর্শনশাস্ত্রের পরিভাষা অনুসারে সংযোগ বলা যাইতে পারে। সংযোগ যতই ঘনীভূত হয়, অর্থাৎ সংযোগ যতই সংহতিতে পরিণত হয়, একের কল্যাণ ততই অন্যের কল্যাণকে আশ্রয় করিয়া পরিপুষ্ট হয়। অট্টালিকার দেহ হইতে স্থানচ্যুত হইলে ইটের যে পরিমাণে অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা, কোনও অঙ্গের দ্বারা জীবদেহের স্বাস্থ্যহানি হইলে সেই অঙ্গের অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা তাহা অপেক্ষা বেশী।

সামাজিক স্বাস্থ্য, শারীরিক স্বাস্থ্যের মত, ব্যষ্টিধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং সমাজদেহের অঙ্গগুলি চেতনপদার্থ বলিয়া সঙ্ঘশক্তির পরিণতির সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যেক অঙ্গের কল্যাণপথ সুপ্রশস্ত হইয়া থাকে। এস্থলে সংহতি যে কেবল "কার্য্যসাধিকা" তাহা নয়, পরন্তু সংহতি প্রত্যেক অঙ্গের কল্যাণসাধিকা। আর এই সংহতিপুষ্টির ফলে পরস্পরের কল্যাণ এমন নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ হয় যে, সমাজদেহকে আঘাত করিয়া তাহার প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে প্রতিহত করিতে কেহই পারে না। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই কথাটি পরিস্ফুট করা যাইতে পারে। চোরের উদ্দেশ্য নিরাপদে পরস্বাপহরণ। প্রহরীর সতর্কতা, পুলিশের সুতীক্ষ্ণদৃষ্টি ও আইনের সুবিস্তৃত গণ্ডীর হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া অন্যের ধনদৌলত নিজে ভোগ করিতে পারিলেই চোরের উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইল। সুতরাং চুরি করিবার সময়, প্রহরী, পুলিশ প্রভৃতিকে কার্য্যসিদ্ধির পরিপন্থী বলিয়াই সে মনে করে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে অপহৃত ধন তাহার নিজস্ব সম্পদ্ হইল, সেই মুহূর্ত্ত হইতে সম্পদ্ রক্ষা করিবার জন্য ঐ প্রহরী ও পুলিশেরই আশ্রয় তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। চোর যদি জানিত যে, একমুহূর্ত্তের অপহৃত ধন পরমুহূর্ত্তেই তাহার নিকট হইতে অপহৃত হইবে, তাহা হইলে তাহার স্তৈন প্রবৃত্তি অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইত। ধনাগমের সময় কল্যাণকণ্টকভ্রমে যাহাকে পথ হইতে দূরে ফেলিতে চাহিয়াছিল, উপভোগের সময় তাহাই কণ্টকবেষ্টনীর

মত ধনরক্ষার অপরিহার্য্য সহায় হইয়া দাঁড়াইল্। গৃহস্বামী এবং তস্করের মঙ্গলাধার এক বলিয়া তস্করবৃত্তির এই অসঙ্গতি। এইজন্য কোন কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, যাহা সমাজদেহের স্নায়ু বা পেশীবন্ধনী সুদৃঢ় করে, তাহাই নীতিশাস্ত্রসম্মত কাজ, আর যে কাজের দ্বারা সমাজস্নায়ুর শক্তি শিথিল হয়, তাহারই নাম অপরাধ ও অধর্ম্ম।

সমাজবিদ্রোহীর প্রত্যেক কাজ এইভাবে বিশ্লেষণ করিলে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপরের অমঙ্গল সাধন করে বলিয়াই সে যে স্বার্থান্ধ তাহা নয়, পরন্তু স্বার্থের প্রকৃত পথ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতাই তাহার অন্ধত্ব। এইজন্যই প্রাচীন গ্রীকদেশীয় দার্শনিকগণ বলিতেন যে, নৈতিকধর্ম্ম তত্ত্বদর্শনেরই নামান্তর মাত্র। আপনার কল্যাণের পথ স্বেচ্ছায় কেহ পরিত্যাগ করে না। অদূরদর্শী অজ্ঞানী কেবল বুদ্ধির দোষেই বিপথগামী হইয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি এই অর্থে সত্যসত্যই মানুষের রিপু।

ইদানীন্তন জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন এবং প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন জীবজগতের পর্য্যায়-বিভাগের কারণ। কিন্তু যাহা পশুজগতের আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে, সেই নিয়ম সমাজধর্ম্মী মনুষ্যজগতে খাটিতে পারে না। সিংহশার্দ্দূল হিংসাপ্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইলেও প্রাণধারণ করিতে পারে, তাহার কারণ, পশু দলবদ্ধ হইলেও তাহাদের মধ্যে সঙ্ঘশক্তির পরিণতি হয় না। ক্ষুৎপিপাসাদির

উৎপীড়ন প্রশমিত করা জীবমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, কিন্তু সমাজধর্ম্মী জীবশ্রেষ্ঠ মানুষ প্রবৃত্তির দাসত্ব স্বীকার করিয়া বাঁচিতে পারে না বলিয়া যথেচ্ছাচারীকেও বাধ্য হইয়া সংযম শিক্ষা করিতে হয়, এবং চরিত্রহীনকেও কিয়ৎপরিমাণে প্রবৃত্তির প্রেরণা সংযত করিতে হয়। সুতরাং যাঁহারা পশু ও মানুষের মধ্যে এই মৌলিক প্রভেদ না বুঝিয়া সংস্কারকের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সঙ্কল্প মহৎ হইলেও সুফলপ্রসূ হওয়া সম্ভবপর নয়। দয়াদাক্ষিণ্য, স্বার্থত্যাগ, সত্যপ্রীতি, সরলতা, শিষ্টাচার প্রভৃতি নীতিশাস্ত্রোক্ত গুণগুলি সমাজস্থিতির স্তম্ভস্বরূপ। অধ্যাত্মমন্দিরের এই মহামূল্যরত্নের অসদ্ভাব হইলে জড়শক্তির ধ্বংসলীলা কিপ্রকার ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করে, তাহা আধুনিক সভ্যতার দুর্নিবার গতি নিরীক্ষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। জাতিসঙ্ঘ, অস্ত্রসঙ্কোচ সমিতি প্রভৃতির প্রস্তাবগুলি আজ বাত্যাতাড়িত তরণীর মত জড়দেবতার সংহারস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং আধ্যাত্মিক শক্তিই সমাজস্থিতির মূল কারণ; ইহা বিস্মৃত হইয়া প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন মনুষ্যসমাজের উন্নতির কারণ বলিয়া ভুল করিলে জীবনযুদ্ধে জয়লাভের আশা দুরাশা মাত্র। চরিত্রহীনকে জয়মাল্য দিয়া পরিতৃপ্ত করা আর মৃগতৃষ্ণিকার পশ্চাদ্ধাবন করা, এই দুইই ব্যর্থ অভিযান।

আজ কন্যাকুমারিকা হইতে হিমাচল পর্য্যন্ত জীবনসংগ্রামের সুদূরপ্রসারী কোলাহল শুনিয়া যাঁহাদের হৃদয় দ্রবীভূত

হইয়াছে, যাঁহাদের স্বার্থত্যাগের হোমাগ্নিশিখা বিশ্ববিস্তৃত হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে, তাঁহারা সকলের নিকটেই শ্রদ্ধাঞ্জলি পাইবার যোগ্য। যুগে যুগে এই প্রকার মহানুভব দধীচির আবির্ভাব না হইলে জগতের ইতিহাস আমূল রূপান্তরিত হইয়া যাইত। কিন্তু জীবনযুদ্ধের অস্ত্রাগারে এই অস্থিবজ্র নির্ম্মাণের কোনই উপকরণ নাই। সুতরাং আজই যদি ভারতীয় শিক্ষাকেন্দ্রগুলিকে জীবনযুদ্ধের উপযোগী অস্ত্রাগারে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতেই ভারতীয় সভ্যতার আদ্যশ্রাদ্ধের আয়োজন করিতে হইবে, একথা কে অস্বীকার করিবে? ইহা সত্য যে, শিক্ষাকেন্দ্রেও সংস্কারের উপযোগিতা আছে; কিন্তু তাহার দিগ্‌নির্ণয় করিবার সময় সমাজস্থিতি ও সামাজিক কল্যাণের প্রকৃত আশ্রয় বুঝিতে না পারিয়া শিবমন্দিরে শিবামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলে জাতীয় সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হওয়া দূরের কথা, পরন্তু অকল্যাণের দ্বারই উন্মুক্ত করা হইবে। সাহিত্যরসের অমৃতনিঃস্যন্দিনী স্রোতস্বিনীর সন্ধান না পাইলেও জীবনযাপন করা যায়; বিদেশীয় ইতিহাস এবং স্বদেশের সৌরভসম্ভারবাহী পুরাবৃত্তের সহিত পরিচয় না থাকিলেও বাঁচিয়া থাকা যায়; সুদূরগ্রহনক্ষত্রাদির বিচিত্র কাহিনী না জানিলেও জীবনপথে কোন বিঘ্ন ঘটে না; আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব সমীক্ষিত না হইলেও সভ্যজগতে বাস করা যায়;—কিন্তু চরিত্র-শক্তি না থাকিলে যে আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতার আবির্ভাব হয়, তাহা সকলপ্রকার কল্যাণের হৃৎপিণ্ডকে আশ্রয় করিয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোন বিষয়ের তত্ত্বদর্শন করাই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এ পর্য্যন্ত সামাজিক কল্যাণের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া যাহা বলা হইল তাহাকে সমাজদর্শন কিংবা সমাজবিজ্ঞান বলা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রীক সভ্যতার যুগে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকের বিষয়ব্যবস্থা ছিল না বলিয়া বৈজ্ঞানিককেও দার্শনিক বলা হইত। কিন্তু বর্ত্তমানে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের চরমতত্ত্ব দর্শন করা প্রয়োজনীয় মনে করেন না। দর্শনশাস্ত্রের আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে দুই একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।

সামাজিক ও সাধারণ জীবন ছাড়া মানুষের আরও একটি জীবন আছে তাহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে না পারিলে মানুষ পরমতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। আজীবন কারারুদ্ধ অবস্থাতে সহস্রবর্ষব্যাপী আয়ু কেহই কামনা করে না; স্বাস্থ্যহীন জীবনের ভার অনেকের পক্ষেই দুর্ব্বিষহ; কলঙ্কিত জীবনের অপমান হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মানুষ স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। এইসকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, মানুষ কেবল দেহধারণ করিয়া তৃপ্ত হয় না। পশু চায় বাঁচিতে, কিন্তু মানুষ চায় মানুষের মত বাঁচিতে। পশুর পক্ষে জীবনধারণ করা ও জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করার মধ্যে কোনই ব্যবধান নাই; কিন্তু মানুষ স্বাতন্ত্র্য, সম্মান, স্বাস্থ্য প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণে জীবনকে গৌরবমণ্ডিত না করিয়া তৃপ্ত হয় না। এই যে মানুষের মধ্যে

পূর্ণমনুষ্যত্ব অঙ্কুরিত করিবার অদম্য প্রয়াস, তাহার মূল্যতালিকা দৈনিক-জীবনের দেনাপাওনার খাতার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দেহেন্দ্রিয়াদিকে আত্মা বলিয়া মনে করা, এবং তাহাদের কল্যাণকে আধ্যাত্মিক কল্যাণ বিবেচনা করা, দর্শনশাস্ত্রে দেহাত্মবাদ, ইন্দ্রিয়াত্মবাদ প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছে। আত্মা দেহেন্দ্রিয় হইতে পৃথক বস্তু, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্য সকল দেশের সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিকই অশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের যুক্তিচাতুর্য্য ও প্রমাণপদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে ধৈর্য্যচ্যুত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তত্রাপি প্রসঙ্গক্রমে একটি সহজবোধ্য তথ্যের উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

প্রবাদ আছে যে, বিদেহাধিপতি জনক বহুদক্ষিণ যজ্ঞ করিবার সময় কুরুদেশীয় ও পঞ্চালদেশীয় বহুপণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে সমবেত পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্য পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এবং এই বিষয়ে যিনি পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইবেন তাঁহাকে সুবর্ণশৃঙ্গ সহস্র গোদান করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাব শুনিয়া ঋষিবর যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় ছাত্র সামশ্রবাকে সহস্র গো স্বগৃহে লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। ইহাতে উপস্থিত পণ্ডিতবর্গ ক্রুদ্ধ হইয়া একে একে যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্কে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অশ্বল, আর্ত্তভাগ, ভুজ্যু প্রভৃতি দার্শনিকগণ ব্রহ্মবিষয়ে

নানা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, আর যাজ্ঞবল্ক্য তাহার উত্তর দিয়া নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে লাগিলেন। এমন সময় উষস্তনামে এক ব্রাহ্মণ যাজ্ঞবল্ক্যের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য একটি জটিল প্রশ্নের অবতারণা করিয়া বলিলেন—ব্রহ্ম সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষস্বরূপ সর্ব্বান্তর পরমাত্মা, অতএব শৃঙ্গ ধরিয়া যেমন "ইহাই গো" বলিয়া গোদর্শন করান হয়, সেইরূপে আমাকেও আত্মার দর্শন করাইয়া দাও। যাজ্ঞবল্ক্য কার্য্যকারণ সম্বন্ধের সাহায্য লইয়া আত্মতত্ত্ব বুঝাইতে নানাপ্রকারে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহাতে সাক্ষাৎভাবে আত্মদর্শন হইল না। তখন উষস্ত বলিলেন, "দশসহস্র গোলাভ করিবার জন্যই তুমি যে এই সকল ছল-কপটতার আশ্রয় লইতেছ তাহা বুঝিতে পারিলাম!"

জগতে উষস্তের অসদ্ভাব কোনকালেই ছিল না,—এখনও নাই। যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না, তাহাকে আমরা হস্ত দিয়া স্পর্শ করিতে এবং চক্ষু দিয়া দর্শন করিতে চাই, আর এই চেষ্টা ব্যর্থ হইলেই যাঁহারা দেহাতীত বস্তুর কথা উত্থাপিত করেন, তাঁহাদিগকে প্রবঞ্চক কিংবা আত্মপ্রতারক বলিয়া মনে করি। কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও তাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জড় চৈতন্যাশ্রিত কি না, তাহার মীমাংসা না হইলেও ঐকথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, চৈতন্যশক্তি না থাকিলে জড়জগৎ প্রকাশিত হইতে পারে না। এই অর্থে জড়জগৎ

চৈতন্যাশ্রিত বলা যাইতে পারে। এই সরল সত্য না বুঝিয়া আমরা অনেকেই অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া মনে করি, এবং অনাত্মার কল্যাণ সাধনের সময় আধ্যাত্মিক কল্যাণের কথা বিস্মৃত হই। অনাত্মাকে আত্মা বলিয়া ভুল করা সূক্ষ্মদৃষ্টি দার্শনিকগণ মানুষের সকল অনর্থ ও দুঃখের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং ভারতীয় দার্শনিকগণ প্রায় সমস্বরেই আত্মদর্শনকে পরমধর্ম্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু যে যুগে, আত্মা দার্শনিকের কপোলকল্পিত বস্তুমাত্র, আত্ম-সংযম সুপ্রাচীন নীতিশাস্ত্রের কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নয়, শিষ্টাচার আত্মপ্রত্যয়হীন মনের রোগবিশেষ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিদ্রূপাত্মক শব্দ মাত্র, সে যুগে অধ্যাত্মমন্দিরের ভগ্নস্তূপের উপর জড়দেবতার বিরাট্ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া কল্যাণের পথ অবরুদ্ধ করা খুবই স্বাভাবিক। ভারতের এই আত্ম-বিস্মৃতির যুগে দার্শনিকের কর্ত্তব্য ভারতবাসীকে মনে করিয়া দেওয়া—

সত্যমেব জয়তি নানৃতং সত্যেন পন্থা বিততো দেবযানঃ।
যেনাক্রমন্ত্যৃষয়ো হ্যাপ্তকামা যত্র তৎ সত্যস্য পরং নিধানম্॥

অবসন্ন সাহিত্য

সুধীবৃন্দ! আমাদের এই প্রয়াগ বিশ্ব-বিদ্যালয় বঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনের তরফ হইতে আমি আজ আপনাদিগকে স্বাগত-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিতেছি। সমস্ত বৎসরের ত্রুটি ও বিঘ্নজাত পুঞ্জীভূত অমঙ্গল আজ আপনাদের পূতস্পর্শে বিদূরিত করিবার জন্যই এই বাৎসরিক মিলনের আয়োজন। এই নবীন যাত্রীটি আপনাদের সমবেত স্নেহ ও সহানুভূতির তীর্থসলিলে অবগাহন করিয়া মহিমাময় দীর্ঘজীবন লাভ করিবে, আপনাদের প্রদত্ত আশা ও উৎসাহের কল্যাণ মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিরায় শিরায় নবজীবনের স্পন্দন অনুভব করিবে এই জন্যই বৎসরান্তে এই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমান সময়ে এই প্রকার অনুষ্ঠান সাহিত্যের পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। আমরা যে যুগের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, সেটি হিসাবনিকাশের যুগ; বিশ্ব জুড়িয়া মানুষের আজ হিসাব নিকাশ চলিতেছে। আমরা এখন যুগসঞ্চিত নিখিল সম্পদগুলি বর্ত্তমান উপকারিতার কষ্ঠীপাথরে কষিয়া দেখিতে ব্যস্ত। কিন্তু এই পরীক্ষার যে গুরুদায়িত্ব তাহা বোধ হয় সম্পূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করি না। রুষো, ভল্‌টেয়র প্রভৃতি পশ্চিমের যুগপুরোহিতগণ যে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মানুষের বন্ধনমুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন, তাহার

জগদ্ব্যাপী প্রভাবে যে বহুকল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহা সত্য। মানুষ আজ তাহার বন্ধনমুক্ত সত্তার ইঙ্গিত পাইয়াছে। কিন্তু একদিকে যেমন তাহার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য পরিণতি লাভ করিতেছে অন্যদিকে ভেদবুদ্ধি প্রকটিত হইয়া মানুষকে আত্মবিস্মৃত ও বিকলাঙ্গ করিয়া তুলিতেছে। আমরা বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছি যে স্বাতন্ত্র্য ব:টি প্রকৃতপক্ষে একটি পূর্ণসত্তা। বন্ধনমাত্রেই প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের পরিপন্থী নহে। অপরকে নিজের পরিণতির সহকারী উপকরণ না বুঝিয়া যদি তাহার সত্তা উপেক্ষা করিয়া স্বাতন্ত্র্য খুঁজিতে যাই, তাহা হইলে উহা চিরকালই আকাশকুসুমের ন্যায় অপ্রাপ্যই থাকিবে, কারণ ভেদবুদ্ধি পুষ্ট করিয়া যে স্বাধীনতা বাঁচিয়া থাকে সেটি নিতান্তই অলীক। আকাশের দিগন্তব্যাপী নীলপটের উপর বিচিত্রবর্ণের রেখাসম্পাত করিয়া জড়প্রকৃতি রামধনুরূপে তাহার অন্তর্নিহিত অসীম-সৌন্দর্য্য সম্পদ মানুষকে উপঢৌকন দিয়া থাকে। মানুষ জড়ের এই আত্মপরিচয় অবিশ্বাস করিয়া মনে ভাবে যে জড়প্রকৃতিকে যতক্ষণ চৈতন্যসাঙ্কর্য্য হইতে মুক্ত করিতে না পারা যায় ততক্ষণ তাহার স্বতন্ত্র রূপ অপ্রকাশ থাকিবে। কিন্তু জ্ঞানাভিমানী মানুষ যখন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে জড়কে চৈতন্যবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া রামধনুর স্বতন্ত্র-সত্তা করতলগত করিতে প্রকৃতির দ্বারস্থ হয়, তখন প্রকৃতি-সুন্দরী এই অপ্রেমিক বৈজ্ঞানিকের আগমনে যেন কতকটা বিরক্তি ও বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া আপনার অনিন্দিত

সৌন্দর্য্যরাশি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুর অন্তরালে গুপ্ত করিয়া দেয়। এই ভাবে মানুষ তাহার সুমেরু পরিমাণ নীরস যন্ত্রাদি লইয়া প্রকৃতিদেবীর সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করে, ততই কতকগুলি বায়ুতরঙ্গ, ঈথর-উর্ম্মি ও তড়িৎ-প্রবাহ প্রভৃতি কুৎসিত বস্তু বৈজ্ঞানিকের চোখের সম্মুখে ছড়াইয়া দিয়া শব্দরূপময়ী প্রকৃতি-সুন্দরী তাহার মাধুর্য্যময় অন্তরের দ্বারে অর্গল বদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু চাহিয়া দেখুন শিল্পীর দিকে। প্রেমিক শিল্পী, নীরস বৈজ্ঞানিকের পথ পরিহার করিয়া জড়চৈতন্যের মিলনসঙ্গীতেই জড়ের পূর্ণ-সত্তার পরিচয় পান। তিনি বলেন, "আমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।" বিজ্ঞানের পথ বিচ্ছেদের পথ, সেইজন্য সৌন্দর্য্যের উপাসক প্রেমের পূজারী শিল্পী, বিজ্ঞান প্রদর্শিত পথে চলিতে ভয় পান। তিনি জানেন যে, যাহা সত্য তাহাই পূর্ণ, আর যাহা পূর্ণ তাহাই সুন্দর। আমার মনে হয় এইটিই প্রকৃত স্বাধীনতার ভারতীয় আদর্শ। স্বাধীনতার মাদকতায় মত্ত হইয়া আমরা ভেদবুদ্ধির অন্ধ উপাসক হইয়াছি ও তাহার ফলে মানুষের অখণ্ড পূর্ণসত্তা বিস্মৃত হইতে বসিয়াছি। সুতরাং হিসাবনিকাসের সময় কেবল দৈহিক প্রয়োজন গুলিই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমাদের বিচার-বুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত করে। আর সাহিত্য, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা প্রভৃতি উচ্চ আদর্শগুলির মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার সময় ভৌতিক দেহই একমাত্র মানদণ্ড হয়। এই জন্যই আমাদের কোন

প্রকার নিরপেক্ষ সাধনার পথে এত বাধা ও বিঘ্ন। তাই এই প্রকার বাৎসরিক মিলনের প্রয়োজন। আপনারা বৎসরান্তে এখানে সম্মিলিত হইয়া আমাদের সুপ্তসংস্কার প্রবুদ্ধ করিয়া দিবেন। আমাদিগকে বলিবেন—অমৃতের পুত্র তোমরা, আজ মনে কর আর্য্যঋষিগণের সেই উদ্দীপনাময়ী আশার বাণী, যে বাণী একদিন ভারতের পুণ্যতপোবন মুখরিত করিয়াছিল—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। যাহা কল্যাণময়, যাহা পূর্ণ, যাহা আনন্দময়, তাহার প্রাপ্তির পথ চিরকালই বন্ধুর ও বিঘ্নসঙ্কুল। কিন্তু নিরস্ত হইও না, অবসন্ন হইও না।

যখনই এই সম্মিলনীর তরফ হইতে আমাকে অভিভাষণের জন্য আহ্বান করা হয়, তখনই আমার মনে একটি আশঙ্কা জাগিয়া উঠে। আমাদের এই সম্মিলনীটিকে বহু কষ্টেই জীবিত রাখা হইয়াছে। যে উদ্দেশ্য লইয়া সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করা হইয়া থাকে, আমরা সে উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথে যে বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তত্রাপি আমার বিশ্বাস, ইহার জন্ম একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। রিকেট্‌গ্রস্ত শিশু নিজে ক্ষুদ্রকায় হইলেও যেমন মাতা পিতার কতকগুলি সুকুমার বৃত্তি বিকাশের কারণ হইয়া থাকে, তেমনই এই পুষ্টিহীন সম্মিলনীটি পরোক্ষভাবে আমাদের মধ্যে সাহিত্য চর্চ্চার প্রেরণা জাগাইয়া রাখিয়াছে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, আপনাদের মধ্যে যেটুকু

সাহিত্যরসের অমৃতধারা এখনও ক্ষীণ ভাবে প্রবাহিত হইতেছে, আমার রসহীন দার্শনিক তত্ত্বের বালুকাস্তূপে পড়িয়া সেটুকুও হয়তো লুপ্ত হইয়া যাইবে। এইটিই আমার আশঙ্কা। অবশ্য এ কথা আমি কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না যে, দর্শনশাস্ত্র সত্যের যে অখণ্ড রূপটি বিশ্লেষণপটীয়সী বুদ্ধির সাহায্যে প্রকটিত করিতে চায় তাহার সহিত সাহিত্যের বাস্তুবিকপক্ষে কোনই সম্বন্ধ নাই। তাত্ত্বিক দৃষ্টির পথ অবরুদ্ধ না করিলে সাহিত্যরসের আস্বাদন পাওয়া যায় না এ বিশ্বাস আমার নাই। আমার আশঙ্কাস্থল অনত্র। কেবল-মাত্র তাত্ত্বিক দৃষ্টির শক্তি সাধনা করিলেই সাহিত্যিকের কর্ত্তব্য শেষ হয় না ; সত্যের যে আনন্দময় সত্তাটি আমি নিজে অনুভব করিয়াছি, যে অমৃতের সন্ধান আমি নিজে পাইয়াছি, তাহা সকলের সহিত সমবেত ভাবে উপভোগ করিতে না পারিলে সাহিত্যের প্রকৃত সাধনা হয় না। কিন্তু এই যে অনুভূত রসের পরিবেশন এটি শিল্পীর কাজ। ইহার জন্য কি পরিমাণ শিল্পচাতুর্য্যের প্রয়োজন তাহার একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে! আপনারা সকলেই জানেন, মানুষের প্রকৃতিগত যত প্রকার বৈচিত্র্য আছে তাহার মধ্যে রসবৈচিত্র্যই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। শ্বেতবর্ণ চক্ষুর সম্মুখে ধরিলে কতকগুলি পাণ্ডুরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকলেরই একই প্রকারের অনুভূতি হইয়া থাকে। তেমনই দীনজনকে দয়া কর, সদা সত্য কথা বল, ইত্যাদি নীতিবাক্যগুলি প্রায় সকলেই একই ভাবে বিশ্বাস

করিয়া থাকেন। কিন্তু রসক্ষেত্রে ভিন্নরুচয়ো হি লোকাঃ। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে একই বস্তু বিচিত্র রসের সৃষ্টি করে। এ দেশের জ্যৈষ্ঠমাসের প্রখর রৌদ্রে স্বেদসিক্ত শকটচালক ভাব-গদগদচিত্তে যখন তাহার রোদনোপম সুরমাধুর্য্যের লহরী তুলিয়া বিশ্বকে আনন্দরসে প্লাবিত করিতে চেষ্টা করে, তখন সে নিজেকে একজন উচ্চদরের শিল্পী মনে করিলেও অনেকের অন্তরেই বীভৎসরসের বন্যা ডাকিয়া আনে। তেমনই আমাদের কীর্ত্তনবিশারদ মহাশয় তাঁহার তিলকাঙ্কিত কোকিল-কৃষ্ণ নধরবপু দোলাইয়া খোলকরতালের সুতীব্র ধ্বনিতে সভাগৃহ কম্পিত করিয়া, মনুষ্যকণ্ঠের উচ্চতম পর্দ্দা হইতে যখন শ্রোতৃবর্গের অন্তরে বিশুদ্ধ ভক্তিরস সিঞ্চন করেন, তখন অনেকেরই যে ধৈর্য্যচ্যুতিই ঘটিয়া থাকে, সে সংবাদও নিতান্ত বিরল নহে। এই প্রকার রসবৈচিত্র্যের প্রধান কারণ প্রকৃতিগত সংস্কারবৈচিত্র্য। কেবলমাত্র নিপুণ শিল্পীর কর-স্পর্শে এই সংস্কারশৃঙ্খলের দুশ্ছেদ্য বন্ধনের মধ্য দিয়াও রসের মুক্তধারা প্রবাহিত হয়। সেইজন্যই শিল্পীশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ বঙ্গকবি হইয়াও আজ বিশ্বকবি। ভারতের একটি প্রান্তে বসিয়া তিনি যে সুরের উৎস খুলিয়া দিয়াছেন তাহা হইতে সহস্রমুখী রসনির্ঝরিণী নির্গত হইয়া জাতি ধর্ম্ম এমন কি রুচিনির্ব্বিশেষেও মানুষের অন্তঃকরণ সিক্ত করিয়াছে। দার্শনিকের প্রধান লক্ষ্য মস্তিষ্ক, কিন্তু তিনি যতক্ষণ বিচারলব্ধ তথ্যগুলি হৃদয়স্পর্শী করিতে না পারেন, ততক্ষণ তাঁহাকে

সাহিত্যিক বলা যায় না। সত্যকে সুন্দর করিয়া প্রকটিত করা, বুদ্ধিগ্রাহ্য তথ্যকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করা, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করা, এই গুলিই সাহিত্যিক শক্তির পরিচায়ক। আর এই শক্তি বর্ত্তমান বক্তার নাই বলিয়াই ভয় হয় যে হয়তো আমার দার্শনিক কথাগুলি নিতান্তই অসাহিত্যিক বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু মানুষকে তাহার নিজের স্কন্ধে উঠিতে, কিংবা স্রোতস্বিনীকে উচ্চে প্রবাহিত হইতে অনুরোধ করিলে যে ফল হয়, দর্শনশাস্ত্র একেবারে বর্জ্জন করিয়া আমার বক্তব্য বলিতে অনুরোধ করিলেও সেই ফলই হইবে। সুতরাং আশা করি আপনারা একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া আমার এই তত্ত্বাঘাত সহ্য করিবেন।

আমরা বক্তব্য বিষয় সাহিত্য। হিন্দী, গুজরাটী প্রভৃতি ভারতীয় সাহিত্যের কথা বলিবার আমার অধিকার নাই। তবে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের গতিবিধি একটু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আলোচনা করিলে মনে হয় যে বাঙ্গলার সাহিত্যজগতে একটা যেন গভীর অবসাদ আসিয়া পড়িয়াছে। এই অবসাদের পরিচয় অনেক ভাবেই আমাদের সাহিত্যানুশীলনের মধ্য দিয়া পাওয়া যাইতে পারে। আধুনিক বঙ্গসাহিত্য বলিতে আমরা বুঝি হয় উপন্যাস নতুবা মাসিকপত্রিকা। ইহার মধ্যে উচ্চদরের মাসিকপত্রিকার সংখ্যা খুবই অল্প একথা সাহিত্যিকগণ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। আর উপন্যাসগুলির মধ্যে যে গুলি সত্যই শিল্পচাতুর্য্যের পরিচায়ক তাহাদের অধিকাংশই বিদেশী উপন্যাসের বঙ্গসংস্করণ মাত্র। বঙ্গ-

সাহিত্যে এই যে মৌলিকতার অভাব ও অনুকরণপ্রবণতা ইহাকে আমরা যতই বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া দেখি না কেন, তথাপি অবসাদই যে ইহার জন্মনিকেতন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। আমরা শৈশবাবস্থায় শুনিয়াছিলাম "পরপদাঙ্কিত মার্গে করিতে গমন, কল্পনা-কৌতুকী কবি ভাবে অপমান।" কিন্তু এখন প্রায়ই শুনিতে পাই যে বঙ্গসাহিত্যে বিশিষ্টতা কিংবা মৌলিকতা রক্ষা করিবার চেষ্টা সাহিত্যের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু পরিপুষ্টি ও পরিবর্ত্তন তো এক জিনিষ নহে। নিছক অনুকরণকে স্বাস্থ্যবৃদ্ধি বলিলে আত্ম-প্রতারণারই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। এতদ্ব্যতীত art for art's sake একথাটিও বঙ্গসাহিত্যের আভ্যন্তরীণ দীনতা গুপ্ত রাখিবার একটি অমোঘাস্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে খানেই কল্পনা-বিকৃতি, ভাবগাম্ভীর্য্যের অভাব, কিংবা ঘৃণিত রুচির ব্যঞ্জনা সেই স্থানগুলিকে এই যাদুমন্ত্রের দ্বারা অমর ও দুশ্ছেদ্য করিয়া রাখিবার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

আমাদের সম্মিলনীর বর্ত্তমান অবস্থাও এই অবসাদেরই ফল। ইহা যে কেবল এই স্থানীয় সাহিত্য-কেন্দ্রগুলিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তাহা নহে। ভারতবর্ষের যেখানে যেখানে বঙ্গসাহিত্য-সাধনার প্রতিষ্ঠান আছে, সেই সকল স্থানেই এই প্রকার ঔদাসীন্য ও সাহিত্যিক-বৈরাগ্য সম্মিলনীর শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই অবসাদের একটি গূঢ়তর কারণ আছে, সেই সম্বন্ধে আজ আমি কিছু বলিতে চাই। পাশ্চাত্য-দর্শন চিন্তার ইতিহাসে দেখা যায় যে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে

যে সকল মনীষাসম্পন্ন পণ্ডিতগণ দর্শনশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করিয়া-ছিলেন তাঁহাদের চিন্তাপ্রণালীর কতকগুলি বিশিষ্ট লক্ষণ ছিল। প্রথমতঃ তাঁহারা চক্ষু কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গকেই একমাত্র তত্ত্বসমূহের উদ্‌ভাসক বিবেচনা করিয়া যে সকল পথে ইন্দ্রিয়ের সুস্পষ্ট রশ্মি পড়িতে পারে না, তাহা ভ্রান্তিসঙ্কুল বিবেচনায় পরিহার করাই যুক্তি-সঙ্গত মনে করিলেন। পূর্ব্ব-দার্শনিকগণের ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুবিষয়ক গাম্ভীর্য্যপূর্ণ সুচিন্তিত যুক্তিশৃঙ্খল উন্মত্ত-কল্পনার অতা-ত্ত্বিক রচনা ভাবিয়া ইন্দ্রিয়জাত কষ্টিপাথরের উপর তাহার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। আবার ইহার ফল হইয়াছিল এই যে, সুতীব্র রশ্মিজালের দিকে অধিকক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিলে উজ্জ্বল বস্তুর উপরেও যেমন অন্ধকারের আবরণ আসিয়া পড়ে, তেমনই যে সকল বস্তু প্রথমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও সুস্পষ্ট বিবেচিত হইয়াছিল তাহারাও ক্রমেই অস্পষ্ট ও ধূমাচ্ছন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। পরবর্ত্তী দার্শনিগণ ইহাকে “খণ্ডদৃষ্টির যুগ” বলিয়া থাকেন। একটি সামান্য দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই খণ্ডদৃষ্টির অস-ম্পূর্ণতা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। কতকগুলি পদসমূহের একত্র সমাবেশে একটি বাক্য হইয়া থাকে, সেইজন্য একটি বাক্যকে আমরা সাধারণতঃ “পদসমূহ” বলিয়া ব্যাখ্যা করি। বাক্যের এই আখ্যা সাধারণ দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ বোধ হইলেও, একটু চিন্তা করিলেই বেশ জানা যায় যে পদস্থাপনা কোন একটি নিয়মের অধীন না হইলে অর্থপূর্ণ বাক্য হয় না। যথা —“মিথ্যা

মোহে আত্মবিস্মৃত হওয়ার মত দুর্ব্বুদ্ধির কাজ আর নাই", এই বাক্যটির পদগুলিকে যদি ঠিক এই ভাবেই স্থাপনা করা না হয়, তাহা হইলে ইহার অর্থান্তর কিংবা অর্থাভাবও ঘটিতে পারে। "আত্মমোহে মিথ্যা বিস্মৃত হওয়ার মত দুর্ব্বুদ্ধির কাজ আর নাই," এই স্থলে পদগুলি পূর্ব্বনিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় নাই বলিয়া, বাক্যটির অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আবার এই দ্বিতীয় ভাবের নিয়ন্ত্রণ ও যদি না থাকে তাহা হইলে বাক্যটি একেবারেই অর্থ-হীন হইতে পারে, যেমন—"মোহে কাজ হওয়ার মত আত্ম-দুর্ব্বুদ্ধির নাই আর বিস্মৃত"। এই দৃষ্টান্ত হইতে আমরা খণ্ডদৃষ্টির পঙ্গুতা বেশ বুঝিতে পারি। বাক্যস্থিত খণ্ডপদগুলি প্রত্যেকেই খণ্ডভাবে এক একটি অর্থের ব্যঞ্জক, কিন্তু কেবলমাত্র তাহাদের খণ্ডসত্তার সহিত পরিচিত হইলেই সমস্ত বাক্যের অখণ্ডসত্তা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে না। যে নিয়মের অনুশাসনে পদগুলি স্থাপিত হইলে বাক্যের অখণ্ডজ্ঞান হয়, সে নিয়মটির অর্থ খণ্ডপদগুলির অর্থ অপেক্ষা অস্পষ্ট হইলেও ঐ নিয়মটিই বাক্যের প্রাণ স্বরূপ।

প্রতীচীর অষ্টাদশ শতাব্দীর খণ্ডদৃষ্টি কেবলমাত্র পাশ্চাত্যজগতেরই মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। এমন কি উহা যে কেবল একটি অতীত-কাহিনী, এ কথাও সত্য নহে। যুগে যুগে বিশ্বচিন্তার যে ভাবে পরিবর্ত্তন হয়, ঠিক সেই ভাবেই প্রত্যেক বক্তির মধ্যে উহার একটি ব্যষ্টি-অভিনয় চলে। সেইজন্য আমাদের ব্যক্তিগত বুদ্ধিও প্রথমে খণ্ডদৃষ্টিদুষ্ট হইয়া থাকে। সাহিত্য সাধনায় আমাদের এই

ঔদাসীন্য সেই খণ্ডদৃষ্টিরই পরিণাম। আমাদের প্রকৃত কল্যাণ কি, জাতীয় উৎকর্ষের উচ্চতম সোপান কোন দিকে, কোন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে জাতীয় সম্পূর্ণ সত্তার বিকাশ হইবে, এই সকল প্রশ্নের সমাধান করিতে গিয়া আমাদের দৃষ্টি অসম্পূর্ণ হইলে, সাধনাক্ষেত্রেও উহার ছায়াপাত হইবেই হইবে। আমরা যে যুগে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি তাহাকে ক্রমোন্নতিবাদীগণ যতই মনোরম ও হৃদয়গ্রাহী করিয়া অঙ্কিত করুন না কেন, ইহা যে সকল প্রকার উচ্চ আদর্শের পক্ষে নিতান্তই অনুপযোগী, তাহা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। যে যুগে শুধু বাঁচিয়া থাকিবারই জন্য জীবনব্যাপী বিরাট আয়োজনের প্রয়োজন হয়, যে সময় প্রতিমুহূর্ত্তেই বিনাশের প্রেতমূর্ত্তি দর্শনে অন্তরাত্মা ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, সে যুগে কোন উচ্চ আদর্শের কথা মনে আসিলেও তাহা বিশুদ্ধভাবে অনুভব করা যায় না, পরন্তু দৃষ্টির দোষে কলঙ্কিত ও রূপান্তরিত হইয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ আধুনিক শিক্ষাসংস্কারের কথা বলা যাইতে পারে।

আপনারা সকলেই জানেন যে যাঁহারা আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির আমূল সংস্কার করার প্রয়োজন অনুভব করিতেছেন. তাঁহাদের অনেকেরই বিশ্বাস যে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যতদিন নিছক শিল্পাগারে পরিণত না হয় ততদিন তাহাদের দ্বারা কোন প্রকার মহদুদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে না। যে শিক্ষা পাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্রগণ জীবনের বিঘ্নসঙ্কুল পথকে একটুও সুগম করিতে পারে না, যে শিক্ষার দ্বারা আত্মনির্ভরতার

উন্মেষ ও পরমুখাপেক্ষিতার হ্রাস হয় না, সে শিক্ষা নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য। সুতরাং আমাদের শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যাহাতে জীবন-সংগ্রামে ব্যবহারোপযোগী অস্ত্রাগারে পরিবর্ত্তিত হয় তাহাই একান্ত কর্ত্তব্য। এইটিই আধুনিক শিক্ষাসংস্কারের মূলমন্ত্র। যাঁহারা এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া নবীনযুগের পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভুলিয়া যান যে জীবনসংগ্রামে জয়-মাল্য অর্জ্জন করাই মনুষ্যজীবনের পরমপ্রয়োজন নহে। জীবন-রক্ষার প্রবৃত্তি ও সেই প্রবৃত্তিপুষ্ট কর্ম্ম-কুশলতা সমস্ত জীবজগতেই ন্যূনাধিক ভাবে বর্ত্তমান আছে। সুতরাং শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যদি অস্ত্রাগারেই পরিণত হয়, তাহাতে হয়তো জীবনের কুরুক্ষেত্রে আমরা পাশ্চাত্য সুসভ্যজাতিদিগের সম্মুখীন হইতে পারিব; কিন্তু ইহাতে আমাদের ধর্ম্মযুদ্ধে জয়ী হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি হইবে এ বিশ্বাস আমার আদৌ নাই। প্রত্যেক জাতিরই দেহাতীত একটি চিন্ময় সত্তা আছে তাহার কল্যাণ সাধন কেবলমাত্র ভৌতিক জীবনের উপকরণের উপর নির্ভর করে না; সেইজন্য কেবলমাত্র জমির উৎপাদিকা শক্তি, কলকব্জার পারিপাট্য, আমদানি রপ্তানির তালিকা প্রভৃতির উন্নতি হইতে থাকিলেও বহুস্থলেই ইহাকে প্রকৃত-পক্ষে জাতীয়পুষ্টি বলা যাইতে পারে না। একজন মানুষ কি প্রকারে জীবিকা-অর্জ্জন করে, কি প্রকার পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে, এই সকল তথ্যসংগ্রহ করিলেই যেমন তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইতে পারে না, তেমনই জাতীয় সৈন্য, নৌবহর, ব্যবসা, বাণিজ্য, প্রভৃতির সহিত সম্যক্‌ভাবে পরিচিত হইয়াও

আমরা তাহার সভ্যতার প্রকৃতরূপ জানিতে পারি না। জাতীয় চিন্ময়রূপই তাহার সত্যরূপ, আর এই চিন্ময় সত্তার কল্যাণই তাহার মুখ্য কল্যাণ। এই সনাতন সত্যকে বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা দেশমাতৃকার সেবাব্রত গ্রহণ করিবেন তাঁহাদের জীবনব্রতের উদ্‌যাপন হইবার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সফলতা বা নিষ্ফলতার বিচার করিবার সময় এই কথাগুলি আমাদের ভুলিলে চলিবে না। যদি ভৌতিক জীবনের উৎকর্ষই একমাত্র মানদণ্ড হয়. তাহা হইলে সাহিত্য, সুকুমার শিল্প, কলাবিদ্যা ধর্ম্মনীতি, দর্শনশাস্ত্র প্রভৃতির অনুশীলন সর্ব্বথা নিরর্থক বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু এই গুলিই জাতির প্রাণস্বরূপ. ইহাদের দ্বারাই জাতীয় জীবন গৌরবমণ্ডিত হয়, একথা কে অস্বীকার করিবে? এই গৌরবময় জীবনের সন্ধান দেওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য; খণ্ডদৃষ্টির দোষেই আমরা শূন্যমন্দিরকে উপাস্যদেবতা ভ্রমে অর্চ্চনা করিয়া থাকি। এই খণ্ডদৃষ্টির প্রভাব আমাদের সাহিত্যানুশীলনেও আসিয়া পড়িয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রান্তে বসিয়া যদি আমরা আজীবন সাহিত্যের উপাসনা করি, তাহাতে উপাধিলাভ কিছুমাত্র সুকর হইবে না, সেইজন্যই এই ঔদাসীন্য। কিন্তু যাঁহার মধ্যে তত্ত্বজিজ্ঞাসার বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই, বিশুদ্ধ-জ্ঞান বা নিরপেক্ষ সত্যানুরক্তির বিকাশ হয় নাই, তাঁহার উপাধি বায়সের ময়ূরপুচ্ছবৎ কৃত্রিম সৌন্দর্য্যেরই অভিব্যঞ্জক, এ কথা ভুলিলে চলিবে না। দোষ অবশ্য সম্পূর্ণ ভাবে আমাদের নহে। আমরা

যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেছি তাহার দায়িত্ব ব্যক্তিগত ভাবে বিচার করা অসম্ভব। বিশ্বনিয়ন্তার দুর্ব্বোধ্য অনুশাসনে পৃথিবীর সমাজগুলি এক বিরাটের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ন্যায় ক্রমশঃ নিবিড়ভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেছে, আর তাহার ফলে মানুষের যেখানেই দৃষ্টিভ্রান্তি হউক না কেন, তাহার ক্রিয়া দেহপ্রবিষ্ট বিষের মত সর্ব্বত্রই পরিব্যাপ্ত হইতেছে। খণ্ডদৃষ্টির অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ জীবনসংগ্রাম তীব্র হইতে তীব্রতর রূপ ধারণ করিয়া নিরন্তর অস্ত্রঝন্ঝনার মধ্যে দেহাতীত চিন্ময় বস্তুর সঙ্কেত লুপ্তপ্রায় করিয়া তুলিয়াছে। বিরাটের যে অংশটুকু জলধির উপরিভাগে সুস্পষ্ট দেখা যায় তাহাতেই আমাদের চঞ্চলদৃষ্টি নিবদ্ধ, কিন্তু বারিধিবক্ষে যে রত্নময় অসীম আয়তন নিমজ্জিত রহিয়াছে, তাহার সন্ধান করিবার অবসর নাই। তথাপি এই দুঃসময়েও আমাদিগকে বলিতে হইবে—

তবু বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি, অন্ধ বন্ধ কোরো না পাখা।

কারণ যাহা কল্যাণের আকর, যাহা মঙ্গলময়, যে বস্তু বাস্তবিকই স্পৃহনীয় তাহা কখনই অনায়াসলব্ধ হয় না। যুগ-যুগান্তরব্যাপী মানবপ্রচেষ্টা ও তাহার উত্থানপতনশীল বক্রগতি এই সত্যেরই সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। আজ বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে রুদ্রদেবের যে তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে তাহার ফলে রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই পূর্ব্বগতানুগতিকতার অচল আয়তন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। আর যেহেতু ভারতবর্ষ বিশ্বের

অন্তর্গত, সেইজন্য এই বিশ্বলীলার সহস্রমুখী উদ্দাম মন্দাকিনীর স্রোত আমাদের চিরপুরাতন অচল মহাতাপস তাঁহার পিঙ্গলজটার মধ্যে আর যেন আবদ্ধ রাখিতে পারিতেছেন না। তাই আজ দেশ-ব্যাপী আমূল সংস্কারের বিপুল আয়োজন। এই স্রোতে আমরা যখন অঙ্গ ভাসাইয়া দিই, তখন নিশ্চল শবদেহের মত বাত্যা তাড়িত না হইয়া জীবন্ত মানুষেরই ন্যায় যাহাতে সচেষ্ট ও সজাগ থাকি, সেই শক্তিটুকুই কল্যাণময় পরমেশ্বরের নিকট ভিক্ষা চাহিবার সময় আসিয়াছে।